ISSN: 2249-4332

OPEN EYES

Indian Journal of Social Science, Literature, Commerce & Allied Areas

Volume 22, No. 1, June 2025

S R Lahiri Mahavidyalaya
University of Kalyani
West Bengal

ISSN: 2249-4332

OPEN EYES

Indian Journal of Social Science, Literature, Commerce & Allied Areas

Volume 22, No. 1, June 2025

'Open Eyes : Indian Journal of Social Science, Literature, Commerce & Allied Areas' is a bilingual multidisciplinary **peer reviewed** journal published biannually in June and December since 2003.

- Official journal of the Sudhiranjan Lahiri Mahavidyalaya, Majdia, University of Kalyani, West Bengal, India.
- Covers key disciplines of Humanities and Social Sciences like Economics, Political Science, Sociology, Demography, Development studies, Literature as well as Commerce & Management.
- Open to original research articles as well as scholarly review papers.
- Strives to bring new research insights into the process of development from an interdisciplinary perspective.
- Prospective authors will have to follow styles mentioned in the 'Journal Guidelines' given in the inner leaf of the back cover page of this journal or in the website.

Advisory & Editorial Board

Professor (Dr.) Tapodhir Bhattacharya, Eminent Author & Ex-Vice Chancelor, Assam University

Professor (Dr.) Barun Kumar Chakroborty, Emeritus Professor, Rabindra Bharati University, Kolkata & Ex. Professor, Department of Folklore, University of Kalyani, West Bengal, India.

Professor (Dr.) Apurba Kumar Chattopadhyay, Department of Economics & Politics, Visva-Bharati (A Central University), West Bengal, India.

Professor (Dr.) Jadab Kumar Das, Department of Commerce, University of Calcutta, Kolkata, India.

Professor (Dr.) Samirranjan Adhikari, Department of Education, Sidho-Kanho-Birsha University, Purulia, West Bengal

Professor (Dr.) Md. Mizanur Rahman, Department of English, Islamic University, Kushtia, Bangladesh.

Professor (Dr.) Biswajit Mohapatra, Department of Political Science, North Eastern Hill University, Shillong, Meghalaya, India.

Professor (Dr.) Paramita Saha, Department of Economics, Tripura University (A Central University), Tripura.

Professor (Dr.) Prasad Serasinghe, Department of Economics, Faculty of Arts, University of Colombo, Sri Lanka.

Editor-in-Chief :

Dr. Dipankar Ghosh

Executive Editors :

Dr. Bhabesh Majumder (bmsrlm.100@gmail.com)

Shubhaiyu Chakraborty (shubhaiyu007@gmail.com)

Contents

জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির লোকসংস্কৃতি চর্চার ইতিহাস (১৮২৫-১৯৯৫)
প্রত্যূষকুমার রীত 3

রবীন্দ্রনাথের ‘হে মোর দুর্ভাগা দেশ’
তুষার পটুয়া 10

ভাষার বৈচিত্র্যে বাউল
কৃষ্ণা মাখাল 18

রবীন্দ্র-সমালোচক সুখময় মুখোপাধ্যায়
শিউলি বসাক 26

স্মৃতিকথায় ‘বনের খবর’ : একটি নিবিড় পাঠ
বিজয় দাস 35

Hydro Diplomacy as a Tool for Energy Cooperation in India-Bhutan Relations : An Evaluation
Anshu Yadav 40

Beyond Anthropocentrism : An Ecocritical Study of the Select Writings of Joseph Conrad
Bapin Mallick & Mahamadul Hassan Dhabak 50

Cross-Border Activities : A Case Study on Security of West Bengal
Dipika Lama 59

Relevance of Econometric Applications for Information Managers
Ranjan Karmakar 64

OPEN EYES

জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির লোকসংস্কৃতি চর্চার ইতিহাস (১৮২৫-১৯৯৫)

প্রত্যুষকুমার রীত

আধুনিক বাংলার ইতিহাসে শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতির স্বর্ণোজ্জ্বল অধ্যায় শুরু হয়েছিল জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িকে কেন্দ্র করে। ঠাকুরবাড়ির পুরুষ সদস্যদের পাশাপাশি মহিলা সদস্যরাও সাহিত্য সংস্কৃতির নানা ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। এঁদের লোকসাহিত্য-সংস্কৃতি ভাবনা বাংলা সাহিত্যকে পরিপুষ্ট করেছে। বাংলা লোকসাহিত্যকে আরো শক্তিশালী, মজবুত করেছে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির সদস্যদের লোকসংস্কৃতি চর্চা। রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে অবনীন্দ্রনাথ ও সৌদামিনী দেবী, জ্ঞানদানন্দিনী দেবী, স্বর্ণকুমারী দেবী, হিরণ্ময়ী দেবী, সরলা দেবী, প্রজ্ঞাসুন্দরী দেবী, শোভনাসুন্দরী দেবী, মিলাডা গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতির লোকসংস্কৃতি চর্চার পূর্ণতর ইতিহাস নির্মাণ-ই এখানে গুরুত্বপ্রাপ্ত।

ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট :

সমকালীন ভারতবর্ষের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পরিবার হয়ে উঠেছিল জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি। সাহিত্য সংস্কৃতির নানা ক্ষেত্রেই এই পরিবার অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিল। সাহিত্যচর্চায়, সংগীতচর্চায়, নৃত্যকলা চর্চায়, চিত্রকলা চর্চায়, প্রতিটি ক্ষেত্রেই এ বাড়ির সদস্যরা প্রায় পথ-প্রদর্শকের ভূমিকা পালন করেছেন। এককথায় বাংলার নবজাগরণের পীঠস্থান হয়ে উঠেছিল এই বাড়ি। জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির বিশাল, বিস্তৃত, বিচিত্র এক ইতিহাস আছে। যে ইতিহাস এখনো পুরো লেখা হয়নি।

বাংলার সাহিত্য সংস্কৃতির নানাদিককে ঠাকুরবাড়ির সদস্যরা উদ্‌বোধিত করেছিলেন। সাহিত্য, সংগীত, নৃত্যকলা, চিত্রকলা চর্চার মতো জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির সদস্যদের লোকসংস্কৃতি চর্চা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, তা বিশেষভাবে উল্লেখের দাবি রাখে। জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির লোকসংস্কৃতি চর্চার ইতিহাসটিও খুব উজ্জ্বল, যা এখনো পর্যন্ত তেমনভাবে আলোকিত হয়নি।

প্রত্যক্ষভাবে ঠাকুরবাড়ির সদস্যদের লোকসংস্কৃতি চর্চার পূর্বেও দ্বারকানাথ ঠাকুর (১৭৯৪-১৮৪৬) পরোক্ষভাবে লোকসংস্কৃতি চর্চাকে লালন করেছিলেন। হয়তো সচেতনভাবে না হলেও। বস্তুতপক্ষে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির লোকসংস্কৃতি চর্চার ইতিহাসের সূচনা সেখান থেকেই। নীলরত্ন হালদারকে নানাভাবে পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন দ্বারকানাথ ঠাকুর। ১৮২৫ সালে নীলরত্ন হালদার-এর 'কবিতা-রত্নাকর' প্রবাদ সংকলন প্রকাশিত হয়। উল্লেখ্য উইলিয়াম মর্টন-এর প্রবাদ সংকলন আরো পরে (১৯৩২)। তাই নীলরত্ন হালদার-এর পোষকতা করার জন্য দ্বারকানাথের পরোক্ষ সহযোগিতা বাংলার লোকসংস্কৃতির জগতে মূল্যবান। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা (১৮৪৩) ঠাকুরবাড়ির প্রথম পত্রিকা হলেও এই পত্রিকা প্রকাশের পূর্বেই দ্বারকানাথ, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮১৭-১৯০৫) ঈশ্বর গুপ্তের 'সংবাদ প্রভাকর' (১৮৩১) পত্রিকাকে সাহায্য করেছেন। তারও পূর্বে নীলরত্ন হালদার সম্পাদিত 'বঙ্গদূত' সাপ্তাহিক পত্রটির (১৮২৯) স্বত্বাধিকারীদের মধ্যে ছিলেন দ্বারকানাথ ঠাকুর। 'বেঙ্গল হেরল্ড' পত্রিকা থেকে এইসব তথ্যাদির পরিচয় পাওয়া যায়। দ্বারকানাথ ঠাকুরের জীবন-ইতিহাসে তথ্যগুলি এখনো সংযুক্ত হয়নি। জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির লোকসংস্কৃতি

রীত, প্রত্যুষকুমার : জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির লোকসংস্কৃতি চর্চার ইতিহাস (১৮২৫-১৯৯৫)
Open Eyes : Indian Journal of Social Science, Literature, Commerce & Allied Areas, Volume 22, No. 1, June 2025, Pages : 3-9, ISSN : 2249-4332

চর্চার ইতিহাসে এ এক অনালোকিত অধ্যায়। এখনো কেউ এসব তথ্য উদ্ধার করতে পারেননি। এই প্রবন্ধে প্রথম তা আলোকিত হল।

প্রশান্তকুমার পাল রবিজীবনীর ১ম খণ্ডে লিখেছেন (১৪২৪, পৃ. ১১) "জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি বাংলার সাংস্কৃতিক জগতে যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছিল, তার ভিত্তি রচনা করেন দ্বারকানাথ ঠাকুর। অর্থ, আভিজাত্য, সম্মান ও প্রতিপত্তি দিয়ে তিনি এই পরিবারের যে বিশিষ্টতা দান করেন, পুত্র দেবেন্দ্রনাথ তার সঙ্গে যুক্ত করেন ধর্মমহিমা, পরবর্তী পুরুষে একদিকে পৌত্র রবীন্দ্রনাথ ও অন্যদিকে প্রপৌত্র অবনীন্দ্রনাথ সাহিত্য ও শিল্পের গৌরব তার সঙ্গে যুক্ত করে এই বাড়িকে বাঙালির তীর্থস্থানে পরিণত করেছেন।"

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রাহ্ম ছিলেন। হিন্দুধর্মের আচার-সংস্কার তিনি মানতেন না ঠিকই, কিন্তু অপরের বিশ্বাসের প্রতি হস্তক্ষেপ করতেন না। তাঁর ব্যক্তিগত অভিমত অন্যের উপর জোর করে চাপিয়ে দিতেন না। তাঁর কন্যা সৌদামিনী দেবী 'পিতৃস্মৃতি' নামক রচনায় (প্রবাসী পত্রিকা, ফাল্গুন ১৩১৮, পৃ. ৪৭৫-৪৭৬) জানিয়েছেন—"জামাইষষ্ঠী, ভাইফোঁটা প্রভৃতি লৌকিক প্রথা আমাদের বাড়িতে বরাবর চলিয়া আসিয়াছে।"

জোড়াসাঁকো ঠাকুর পরিবার যেমন পাশ্চাত্য সাহিত্য-সংস্কৃতিকে বর্জন করেনি, তেমনি দেশীয় সংস্কৃতিকেও উপেক্ষা করে নি। ঠাকুরবাড়িতে সঙ্গীতচর্চা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, সেখানে ধ্রুপদ সঙ্গীতচর্চার মধ্যে লোকায়ত সঙ্গীত বলতে যা বোঝায় যেমন—যাত্রাগান, কবিগান, কথকতা, কীর্তন, বাউল প্রভৃতি সবই ঠাকুরবাড়িতে আদৃত ছিল। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আমলে, পৃষ্ঠপোষকতায়।

ঠাকুরবাড়ির সদস্যরা বাংলার লুপ্তপ্রায় সংস্কৃতিকে রক্ষাই করেননি কেবল, রীতিমতো চর্চাও করেছেন। বাংলার লোকসংস্কৃতি চর্চায় জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির এক ধারাবাহিকতা লক্ষ্য করা যায়—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর থেকে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলা লোকসংস্কৃতি চর্চার অন্যতম প্রধান পুরোহিত। তারপর অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য নাম এ বিষয়ে। মহিলা সদস্যদের মধ্যে সৌদামিনী দেবী, জ্ঞানদানন্দিনী দেবী, স্বর্ণকুমারী দেবী, হিরণ্ময়ী দেবী, সরলা দেবী, প্রজ্ঞাসুন্দরী দেবী, শোভনাসুন্দরী দেবী, মিলাডা গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ বাংলা লোকসংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রে মূল্যবান অবদান রেখেছেন।

বর্তমান গবেষণাকর্মের উদ্দেশ্য ও পরিসর

(অ) বর্তমান গবেষণায় জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির বিস্তৃত বিচিত্র ইতিহাসের মধ্যে একটি বিশেষ অংশ তথা জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির সদস্যদের লোকসংস্কৃতি চর্চার ইতিহাসটি উদ্ধার করা যাবে।

(আ) রবীন্দ্রনাথ-অবনীন্দ্রনাথের লোকসংস্কৃতি চর্চা আলোচিত হলেও ঠাকুরবাড়ির অনেকগুলি মহিলা সদস্য-এর লোকসংস্কৃতি চর্চা অনালোকিত ছিল সেদিকটি আলোকিত করবে বর্তমান গবেষণা।

(ই) ঠাকুরবাড়ির সদস্যদের লোকসংস্কৃতি ভাবনার মূল্যায়ন করবে বর্তমান গবেষণা।

(ঈ) বাংলা লোকসংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রে ঠাকুরবাড়ির অবদান কতটা, তা বর্তমান গবেষণা থেকে সুস্পষ্ট হবে।

(উ) বর্তমান গবেষণায় জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির ইতিহাস পূর্ণতা পাবে, বিশেষ একটি দিক আলোকিত হওয়ায়।

ঠাকুরবাড়ির লোকসংস্কৃতিচর্চা

অষ্টম থেকে একাদশ শতকের কোনো এক সময় আদিশূর-এর অনুরোধে কান্যকুব্জ থেকে পাঁচ জন ব্রাহ্মণ বঙ্গদেশে প্রেরিত হন। এই পঞ্চ ব্রাহ্মণের অন্যতম পুরুষ ভট্টনারায়ণ। শোনা যায়, ঠাকুর বংশের উদ্ভব এই ভট্টনারায়ণ

থেকে। এই বংশের ২৬তম বংশধর পঞ্চানন ঠাকুর। ইনি অবিভক্ত বঙ্গদেশের যশোর থেকে গোবিন্দপুরে এসে বসবাস করেন। পরবর্তী সময়ে 'পিরালি' উপাধির পরিবর্তে ঠাকুর উপাধি লাভ করেন। পঞ্চানন ঠাকুরের পুত্র জয়রাম ঠাকুর। জয়রামের চার পুত্র। একজন নীলমণি ঠাকুর। নীলমণির তিনপুত্রের একজন রামলোচন। রামলোচন ও অলকা দেবীর দত্তক পুত্র দ্বারকানাথ ঠাকুর (১৭৯৪)। এখান থেকেই জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির অগ্রগতি এবং ক্রমশ এই বাড়ি বাংলার নবজাগরণের পীঠস্থান হয়ে ওঠে। এ বাড়ির সদস্যরা সাহিত্য-সংস্কৃতি, নাট্যচর্চা, সঙ্গীতচর্চা, চিত্রচর্চা প্রভৃতি নানা ক্ষেত্রে পথ প্রদর্শকের ভূমিকা পালন করেছেন বাংলার ইতিহাসে।

বাংলার লোকসাহিত্য চর্চার ইতিহাস দীর্ঘদিনের। আমরা জানি, উইলিয়াম কেরি এ বিষয়ে কৃতিত্বের অধিকারী। শতাধিক বর্ষ পূর্বে রবীন্দ্রনাথ কলম ধরেছিলেন; বাংলার লোকসাহিত্য চর্চার হাতেখড়ি দিয়ে গিয়েছিলেন। হাতেখড়ি দিয়ে আরও অনেক অগ্রসর করিয়েছেন। বর্তমানে অনেকে লোকসাহিত্য চর্চায় ব্যাপৃত আছেন। কিন্তু নূতন আলোকপাত কেউ করতে পারেননি। সাধারণ মানুষ হল লোক (Folk), লোক সাধারণ। তাদের মুখের সাহিত্যই হল লোকসাহিত্য (Folk Literature), তাদের রীতি-সংস্কার-আচার-বিচার-সংস্কৃতি হলো লোকসংস্কৃতি (Folk Culture)। প্রথমে লোকসাহিত্যের বিভিন্ন উপাদান সংগ্রহ ও তার প্রকাশ, পরে সংগৃহীত তথ্যাদির বিশ্লেষণ করা হয়। বিভিন্ন পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। তারপর মনঃসমীক্ষণ পদ্ধতির সাহায্যে আলোচনা শুরু হয়েছে। আলোচনা বিবৃতিমূলক থেকে ক্রমশ বিশ্লেষণাত্মক হয়েছে। দীর্ঘকালব্যাপী বাংলায় অনেকেই লোকসাহিত্য, সংস্কৃতিচর্চা করছেন। সেই চর্চার ধারাতেও কিছু চিন্তা-চেতনার পরিবর্তনও লক্ষ্য করা যায়।

লোকসংস্কৃতির বহুমুখী বৈচিত্র্যের প্রতি রবীন্দ্রনাথের গভীর আকর্ষণ আজ সর্বজনবিদিত। তাঁর সাহিত্য রচনা ও কর্ম সাধনার প্রায় প্রতিটি পর্বে তিনি লোক-সংস্কৃতির উপাদান থেকে গভীর রসপ্রেরণা লাভ করেছিলেন। লোকসাহিত্য-সংস্কৃতি সংগ্রহে তাঁর উদ্যোগ ব্যক্তিগত উদ্যোগের পাশাপাশি প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগেও সামিল হয়েছিল বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ ও এশিয়াটিক সোসাইটিকে কেন্দ্র করে। তাঁর 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ' প্রবন্ধটি প্রসঙ্গত উল্লেখ্য। সেখানে ছাত্রদেরও তিনি উৎসাহিত করছেন লোকসাহিত্য সংগ্রহ কর্মে।

রবীন্দ্রনাথের পারিবারিক পরিবেশের আনুকূল্য, তাঁর আ-বিশ্বপরিভ্রমণের বিচিত্র অভিজ্ঞতা, স্বদেশি আন্দোলনের তরঙ্গভঙ্গ ও শিলাইদহে পল্লীসান্নিধ্যের অভিজ্ঞতা তাঁর লোকসংস্কৃতি ভাবনাকে পুষ্ট করেছিল। বিশ্বভারতীর শিক্ষাকর্মে, শ্রীনিকেতনের বিচিত্র কার্যে লোকসংস্কৃতির অনুশীলন ও পুনরুজ্জীবনের নানাবিধ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছিল। গ্রামীণ শিল্পের উদ্ধার, লোকশিল্পের চর্চা, আশ্রমে নানাবিধ উৎসব অনুষ্ঠানের পরিকল্পনায় তা দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথ লোকসংস্কৃতিবিদ না হলেও বাংলা লোকসংস্কৃতি চর্চার প্রধান পুরুষ হয়ে উঠেছেন লোকসাহিত্যের সংগ্রহ কর্মে, সংরক্ষণে। অপরকে সংগ্রহ কর্মে উৎসাহ দান লোকসংস্কৃতি বিজ্ঞান সূত্রেই তাঁর অগ্রসর।

রবীন্দ্রনাথের অনেক রূপকথাধর্মী গল্পে কবিতায় লোকসংস্কৃতির প্রসঙ্গ আছে। লোকসংস্কৃতির প্রতি রবীন্দ্রনাথের প্রাথমিক আগ্রহ আকর্ষণ শিল্প রসবোধের দ্বারা উদ্‌বোধিত হলেও লোকসংস্কৃতির ইতিহাস-সমাজ-নৃতত্ত্ব-জাতিতত্ত্বগত দিকগুলিও তাঁর কাছে গভীর আকর্ষণের বস্তু ছিল। 'ছড়া'র আলোচনার প্রতি ছত্রে তা বোঝা যায়। 'আলপনা', যা ছিল ব্রত-পার্বণের অঙ্গ, রবীন্দ্রনাথের আগ্রহে নন্দলাল প্রমুখ আধুনিক গৃহসজ্জায়, মণ্ডপে, কাপড়ে ব্যবহার করেন।

রবীন্দ্রনাথের 'লোকসাহিত্য' গ্রন্থটি উল্লেখ্য। এখানে 'ছেলেভুলানো ছড়া'-১, 'ছেলেভুলানো ছড়া'-২, 'কবিসংগীত', 'গ্রাম্য সাহিত্য' প্রবন্ধ আছে। প্রবন্ধগুলি যথাক্রমে সাধনা, সাহিত্য পরিষদ, সাধনা, ভারতী পত্রিকায় প্রকাশিত।

রবীন্দ্রনাথের অনেক গানে লোকসঙ্গীতের প্রভাব আছে। রবীন্দ্রনাথের বাউল গানগুলি উল্লেখ্য। রবীন্দ্রগানে সারি-জারি-ভাটিয়ালি গানের অনেক প্রভাব আছে।

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৭১-১৯৫১) গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কনিষ্ঠ পুত্র। আন্তর্জাতিক খ্যতিসম্পন্ন চিত্রকর। ইংরাজি-ফরাসি-সংস্কৃত-বাংলা সাহিত্যে অবাধ দখল, বহুভাষাবিদ, প্রাবন্ধিক, গল্পকার। বাংলা লোকসংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রে তাঁর অবদান অসীম। ১৩৩০ সালে 'ভারতী' পত্রিকার বৈশাখ সংখ্যায় তাঁর 'ছেলেভোলানো ছড়া' প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এই দীর্ঘ প্রবন্ধে তিনি বাংলা ছড়াকে নানা দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করেছেন।

তাঁর উল্লেখযোগ্য লোকসংস্কৃতি বিষয়ের গ্রন্থ হল 'বাংলার ব্রত', যা ১৯০১ সালে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে তিনি ব্রত সম্বন্ধে বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা করেছেন। এই গ্রন্থে ব্রতগুলিকে তিনি দুটি ভাগে ভাগ করেছেন,—মেয়েলি ব্রত ও শাস্ত্রীয় ব্রত। মেয়েলি ব্রত-কে আবার দুভাগে ভাগ করেছেন—নারী ব্রত ও কুমারী ব্রত। তিনি বাংলার ব্রত অনুষ্ঠানের পর্যালোচনা করেছেন। ব্যক্তি কামনার মধ্য দিয়ে গোষ্ঠী কামনার মঙ্গল সাধন চেয়েছেন তিনি। প্রকৃত ব্রত ও তার অনুষ্ঠান হল গোষ্ঠী উৎসব। লোকসংস্কৃতি প্রসঙ্গে অবনীন্দ্রনাথের রূপকথাধর্মী রচনাগুলির প্রসঙ্গ অত্যন্ত মূল্যবান।

অবনীন্দ্রনাথ বাংলায় রূপকথার গল্প লিখেছিলেন—'ক্ষীরের পুতুল' (১৮৭৬)। তারপর টডের রাজস্থান ইতিহাস পাঠের পর তিনি রাজপুতদের বীরত্ব, ত্যাগ ও মহিমার এক রূপ জগত নির্মাণ করেন 'রাজকাহিনী' (১৯০১)। কিংবদন্তী নিয়ে লেখেন 'নালক' (১৯১৬)।

'ক্ষীরের পুতুল' বাংলাদেশেরই ব্রতকথা। 'সাধনা' পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ ছেলেভুলানো ছড়া ও মেয়েলি ব্রত সংগ্রহ ও প্রকাশ করতে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন (১৮৯৪)। সহায়তা চেয়েছিলেন অনেকের কাছে। সেই সূত্রে অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় 'মেয়েলি ব্রতের' একটি সংগ্রহ প্রকাশ করেন, তিনি তাঁর ভূমিকা লিখেছেন। অবনীন্দ্রনাথ লিখেছেন, "তিনি কাকিমাকে (রথীর মা) দিয়েও অনেক রূপকথা সংগ্রহ করিয়েছিলেন। কাকিমা সেই রূপকথাগুলি একখানি খাতায় লিখে রাখতেন। তাতে অনেক ভালো ভালো রূপকথা ছিল। তাঁর সেই খাতা থেকেই আমার 'ক্ষীরের পুতুল' গল্পটি নেওয়া"। কিন্তু অঘোরনাথের ব্রতের গল্প আর 'ক্ষীরের পুতুল' এক নয়। অবনীন্দ্রনাথের 'জোড়াসাঁকোর ধারে', 'ঘরোয়া', 'আপনকথা' প্রভৃতি স্মৃতিকথা গ্রন্থগুলি গুরুত্বপূর্ণ। এগুলিতে লোকসংস্কৃতির অনেক তথ্য ছড়িয়ে আছে।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও সারদাদেবীর প্রথমা কন্যা সৌদামিনী দেবী (১৮৪৭-১৯২০)। রবীন্দ্রনাথের বড়দিদি তিনি। বেথুন স্কুলের প্রথম জীবনের ছাত্রী ছিলেন। বাংলা সাহিত্যের উৎকর্ষ বিধানে তাঁর তেমন অবদান না থাকলেও তাঁর একটিমাত্র গ্রন্থ তাঁকে স্মরণীয় করে রেখেছে। তাঁর স্মৃতিকথামূলক গ্রন্থটি হল 'পিতৃস্মৃতি'; প্রথমে তা প্রবাসী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। ঠাকুরবাড়ির রীতি-নীতি-সংস্কার-আচার-বিচার অনেক কিছু পরিচয় মেলে গ্রন্থটিতে, বাংলা লোকসংস্কৃতি চর্চায় যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের দ্বিতীয় পুত্র সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন জ্ঞানদানন্দিনী দেবী (১৮৫০-১৯৪১)। জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির ইতিহাসে জ্ঞানদানন্দিনীর ভূমিকা অবিস্মরণীয়। তিনি ঘোড়ায় চড়তেন। নারী-স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি দৃষ্টান্ত হয়ে আছেন। ঠাকুরবাড়িতে সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চার একটা পরিমণ্ডল তৈরি করেছিলেন তিনি। তাঁর সম্পাদনায় 'বালক' পত্রিকা প্রকাশিত হয়, যেখানে ছোটদের লেখা প্রকাশিত হত। রবীন্দ্রনাথ সম্পাদনায় সহযোগী ছিলেন। তাঁর 'সাত ভাই চম্পা' এবং 'টাক ডুমা ডুম ডুম' নাটিকা দুটি উল্লেখ্য।

জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর স্মৃতিকথা গ্রন্থ 'পুরাতনী' (১৯৫৭) অত্যন্ত মূল্যবান। তিনি চিন্তাভাবনায় সে যুগের থেকে কত এগিয়ে ছিলেন, এই স্মৃতিকথার মাধ্যমে আমাদের তা জানা হয়ে যায়। তাঁর কয়েকটি ভ্রমণকথা ও শিক্ষা বিষয়ক প্রবন্ধ উল্লেখযোগ্য। নাট্যাভিনয়, ফটোগ্রাফি ও চিত্রচর্চায় তাঁর অবদান আছে।

স্বর্ণকুমারী দেবী (১৮৫৬-১৯৩২) হলেন রবীন্দ্রনাথের ন'দিদি। সেকালের সাহিত্যসম্রাজ্ঞী। দু-হাত ভরে সব্যসাচীর মতো লিখেছেন কবিতা, উপন্যাস, গান, নাটিকা, গল্প, প্রবন্ধ, ভ্রমণকথা প্রভৃতি। তিনি সখিসমিতি প্রতিষ্ঠা করেন। ভারতী পত্রিকা সম্পাদনা করেছিলেন।

সখিসমিতির কার্যকলাপে নানা সামাজিক ব্রত, আচার পালন করা হত। বাংলা লোকসংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রে তা গুরুত্বপূর্ণ। সখিসমিতির ইতিহাস এখনো লেখা হয়নি, তা উদ্ধারের অবকাশ রাখে।

হিরণ্ময়ী দেবী (১৮৬৮-১৯২৫) স্বর্ণকুমারী দেবী ও জানকীনাথ ঘোষালের প্রথম সন্তান। ১৮৯৪-এ বোটানির অধ্যাপক ফণিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। তিনি নিজেও অনেক গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ, স্মৃতিকথা রচনা করেছেন। স্বর্ণকুমারী দেবীর সখিসমিতির তিনি উল্লেখযোগ্য কর্মী ছিলেন। মায়ের হাত থেকে ভারতী পত্রিকার সম্পাদনা গ্রহণ করেন। হিরণ্ময়ী দেবীর বিদ্যালয় ও শিল্প শিক্ষাশ্রম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর শিল্পাশ্রম ও সখিসমিতির কার্যকলাপ বাংলা লোকসংস্কৃতি চর্চায় মূল্যবান। এমন কি ভারতী পত্রিকার লোকসংস্কৃতি চর্চাও প্রসঙ্গত স্মরণীয়।

সরলা দেবী (১৮৭২-১৯৪৫) স্বর্ণকুমারী দেবীর ছোটমেয়ে তথা দ্বিতীয়া কন্যা। তৃতীয় সন্তান। তিনি স্বদেশপ্রেমিক ছিলেন। বাংলায় বীরাষ্টমী ব্রত, প্রতাপাদিত্য উৎসব ইত্যাদি প্রচলন করেন। 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার' নামে স্বদেশি সামগ্রী বিক্রয়ের দোকান চালাতেন, যেখান থেকে রবীন্দ্রনাথ সম্পাদিত ভাণ্ডার পত্রিকা প্রকাশিত হত। দিদি হিরণ্ময়ী দেবীর সখিসমিতি, মহিলা শিল্পাশ্রমে তিনিও যুক্ত হন। তাঁর 'শতগান' বিখ্যাত গ্রন্থ। তাঁর স্বামী রাজভজ দত্ত চৌধুরী ছিলেন বিপ্লবী নেতা। সরলা দেবী ভারতী পত্রিকা সম্পাদনা করেন। তিনি অনেক গল্প, প্রবন্ধ, গান লেখেন। তাঁর 'জীবনের ঝরাপাতা' 'স্মৃতিকথা' গ্রন্থটি গুরুত্বপূর্ণ লোকসংস্কৃতি-চর্চার ক্ষেত্রে।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সেজ ছেলে হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের দ্বিতীয়া কন্যা প্রজ্ঞাসুন্দরী দেবী (১৮৭২-১৯৫০) 'পুণ্য' পত্রিকা সম্পাদনা করতেন। সাহিত্যচর্চা, সঙ্গীতচর্চা, রন্ধনচর্চা সব বিষয়ে পটু ছিলেন। 'আমিষ ও নিরামিষ আহার' তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ। অসমীয়া ভাষায় তাঁর দুটি গ্রন্থ আছে 'রন্ধাবড়া', 'জারক'। বাংলা সাহিত্যে রন্ধনচর্চাকে একটা শিল্পের পর্যায়ে নিয়ে গেছেন তিনি। তাঁর আরেকটি খ্যাতি হল মেনুকার্ড প্রচলন। রন্ধনশিল্পকে লোকশিল্পের মর্যাদায় উন্নীত করার মধ্যে দিয়ে প্রজ্ঞাসুন্দরী দেবী বাঙালি জনমানসে অমর হয়ে আছেন।

শোভনাসুন্দরী দেবী (১৮৭৭-১৯৩৭) জয়পুর-এ বাসকালে জয়পুর প্রবাদ-প্রবচনগুলি সংগ্রহ করে দিদি প্রজ্ঞাসুন্দরীর 'পুণ্য' পত্রিকায় প্রকাশ করেন। জয়পুরী লোকগল্পগুলি সংগ্রহ করে 'পুণ্য' পত্রিকায় প্রকাশ করেন। তাঁর 'জয়পুরী কথা' (এবং মুশায়েরা প্রকাশিত) উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। বাংলা লোকসাহিত্যের মূল্যবান সম্পদ গ্রন্থটি। শোভনাসুন্দরী দেবীর 'The Fables and Folklore of India', 'The Oriental Pearls' (১৯১৫) গ্রন্থগুলিও লণ্ডনের ম্যাকমিলান থেকে প্রকাশিত হয়েছিল, যা লোকসাহিত্য চর্চায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রায় অনালোকিত ও অনালোচিত অবস্থায় বিরাজ করছে।

মিলাডা গঙ্গোপাধ্যায় হলেন ঠাকুরবাড়ির বিদেশি বধূ (১৯১৩-২০০০)। অবনীন্দ্রনাথ-সুহাসিনী দেবীর কন্যা করুণার ছেলে মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের সহধর্মিনী। 'এ পিলগ্রিমেজ টু দি নাগাজ' (১৯৮৪) এবং নাগা আর্ট (১৯৯৩)—গ্রন্থ দুটির প্রণেতা মিলাডা গঙ্গোপাধ্যায়। নাগা সম্প্রদায় ছাড়া মিলাডার চেক ভাষাতেও দুটি বই আছে,

যথা—'ইন দ্য ল্যান্ড অফ জুয়েল' ও 'পিকচারস ফ্রম বেঙ্গল'। এছাড়াও বাংলাদেশের পাঁচালি ও মেয়েদের ব্রতকথা নিয়ে মিলাডা লিখেছেন 'বারো মাসের বারো রাজা' (১৯৯৫)। মোহনলালের সঙ্গে যুগ্মভাবে অনুবাদ করেন চেক ছোটগল্প 'নীল চন্দ্রমল্লিকা'। একটি অনালোকিত সম্প্রদায়, তাদের আদিম বর্বর সংস্কৃতিকে তুলে ধরেছেন মিলাডা; যেখানে কারুণ্য ও সম্প্রীতি উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের অনূদিত গ্রীমভাই-এর রূপকথা গ্রন্থটিও লোকসংস্কৃতিমূলক, প্রসঙ্গত একথা উল্লেখ্য।

জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি থেকে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, সাধনা, ভারতী, বালক, পুণ্য, সারদা, চতুরঙ্গ, আনন্দসঙ্গীত প্রভৃতি অনেকগুলি পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে। এখানে ঠাকুরবাড়ির সদস্য ও বাইরের সদস্য অনেকেই লোকসংস্কৃতি চর্চা করেছেন। সবমিলিয়ে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির পত্রিকা বাংলা লোকসংস্কৃতি চর্চাকে অনেক পরিমাণে লালন-পালন করেছে।

গ্রন্থপঞ্জি

আকর গ্রন্থ : বাংলা

১. অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অবনীন্দ্র রচনা সমগ্র, খণ্ড-১, স্মৃতিকথা, দে'জ পাবলিশিং, ২০২২।
২. অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কিশোর রচনা সমগ্র, ১ম খণ্ড, পুনশ্চ, ২০১৩।
৩. ঐ, ২য় খণ্ড, পুনশ্চ, ২০১৩।
৪. অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বাংলার ব্রত, বিশ্বভারতী, ১৯১৯।
৫. জ্ঞানদানন্দিনী দেবী, রচনা সংকলন (পার্থজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত), দে'জ পাবলিশিং, ২০১১।
৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর সংগৃহীত ছেলেভুলানো ছড়া, (প্রত্যুষকুমার রীত সম্পাদিত), জ্ঞানপীঠ পাবলিকেশন, ২০১৬।
৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্র রচনাবলী, প.ব. সরকার, জন্ম-১২৫ বর্ষ সংস্করণ।
৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, লোকসাহিত্য, বিশ্বভারতী।
৯. শোভনাসুন্দরী দেবী, জয়পুরী কথা (প্রত্যুষকুমার রীত সম্পাদিত), এবং মুশায়েরা, ২০০৯।
১০. সরলা দেবী, জীবনের ঝরাপাতা, দে'জ পাবলিশিং, ২০০৯।
১১. সৌদামিনী দেবী, 'পিতৃস্মৃতি' ও অন্যান্য রচনা, দে'জ পাবলিশিং, ২০১১।
১২. হারামণি ও মণিহার, প্রসঙ্গ প্রবাসী (সংকলন ও সম্পাদনা - প্রত্যুষকুমার রীত), নান্দনিক, ২০১৪।

ইংরাজি

১. Shovanasundari Devi, 'The Fables and Folklore of India', Macmilan, London, 1919.
২. Shovanasundari Devi, 'The Oriental Pearls', Macmilan, London, 1915.
৩. Shovanasundari Devi, 'Indian Nature Myth', Macmilan.
৪. Shovanasundari Devi, 'Tales of God of India', Macmilan.

সহায়ক গ্রন্থ

১. অচিন্ত্য বিশ্বাস, লোকসংস্কৃতি বিদ্যা, অঞ্জলি পাবলিশার্স, ২০০৬।
২. আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলার লোকসংস্কৃতি, এ মুখার্জী এণ্ড সন্স, ১৯৮২।

৩. আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলা লোকসাহিত্য, ১ম খণ্ড, এ মুখার্জী এণ্ড সন্স, ১৯৫৪।
৪. আশুতোষ ভট্টাচার্য, রবীন্দ্রনাথ ও লোকসাহিত্য, এ মুখার্জী এণ্ড সন্স, ১৩৮০।
৫. ওয়াফিল আহমেদ, বাংলার লোকসংস্কৃতি, ঢাকা, ১৯৪৭।
৬. কাকলি ধাড়া মণ্ডল, বাংলা লোকসংস্কৃতি চর্চার ইতিহাস, সহযাত্রী, ২০১১।
৭. ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনী, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৯।
৮. ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বারকানাথ ঠাকুরের জীবনী, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৪২০।
৯. চিত্রা দেব, ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহল, আনন্দ পাবলিশার্স, ২০২২।
১০. দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, আত্মজীবনী, সাহিত্যবিহার, ২০২২।
১১. পল্লব সেনগুপ্ত, লোকসংস্কৃতির সীমানা ও স্বরূপ, পুস্তক বিপণি, ২০১০।
১২. প্রত্যুষকুমার রীত, ঠাকুরবাড়ির পত্রিকা পুণ্য, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৯।
১৩. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্রজীবনী ও রবীন্দ্রসাহিত্য প্রবেশক, ১ম খণ্ড, বিশ্বভারতী, ১৪২৬।
১৪. প্রশান্তকুমার পাল, রবিজীবনী, আনন্দ পাবলিশার্স, ১ম খণ্ড, ২০২০।
১৫. বরুণকুমার চক্রবর্তী সম্পাদিত, বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতি কোষ, অপর্ণা বুক ডিষ্টিবিউটার্স, ২০১২।
১৬. বরুণকুমার চক্রবর্তী, বাংলা লোকসাহিত্য চর্চার ইতিহাস, পুস্তক বিপণি, ২০১০।
১৭. যোগেশচন্দ্র বাগল, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সাহিত্য সাধক চরিতমালা, ৩য় খণ্ড (৪৫ নং অধ্যায়), বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, চতুর্থ মুদ্রণ, ১৩৮৪।
১৮. সুমিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ঠাকুরবাড়ির জানা-অজানা, মিত্র ঘোষ, ২০২৪।
১৯. সৌগত চট্টোপাধ্যায়, লোকসস্কৃতি/অন্দর মহল-বার মহল, পুস্তক বিপণি, ২০১০।
২০. হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি (প্রভাতকুমার দাস অনুবাদিত), রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১৯।

সহায়ক পত্র পত্রিকা

১. ভারতী পত্রিকা।
২. সাধনা পত্রিকা।
৩. পুণ্য পত্রিকা।
৪. বালক পত্রিকা।
৫. প্রবাসী পত্রিকা।
৬. বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা।
৭. লোকসংস্কৃতি গবেষণা পত্রিকা।

প্রত্যুষকুমার রীত
সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ।

রবীন্দ্রনাথের ‘হে মোর দুর্ভাগা দেশ’

তুষার পটুয়া

“... তোমার বয়স যতই পাকিতেছে, অভিজ্ঞতা বাড়িতেছে, ততই মানুষের ব্যথায় তোমার মন গলিতেছে, তোমার বীণার ঝঙ্কার গভীর হইতে গভীরতর হইতেছে। মানবের মঙ্গলের জন্য তোমার আকাঙ্ক্ষা ও আগ্রহ যতই বাড়িতেছে ততই তুমি ব্যাকুল হইয়া মঙ্গলময়ের মঙ্গালাসনের সমীপবর্তী হইতেছ। তোমার মঙ্গল বাসনা চরিতার্থ হইক, তুমি অমর হইয়া ভারতের মঙ্গলকামনা করিতে থাকো। তুমি দিগ্বিজয় করিয়া, বাঙ্গালার মুখ উজ্জ্বল করিয়া, আমার সোনার বাঙ্গালায় ফিরিয়া আসিয়াছ; তুমি আমাদের ভক্তি, প্রীতি, শ্রদ্ধা ও স্নেহের উপহার-স্বরূপ এই মূল্যায়ন গ্রহণ করো। বিধাতার সৃষ্টিতে যাহা কিছু সুন্দর, যাহা কিছু সুরভি, সব এই পুষ্পেই আছে। আমাদের যাহা কিছু সুন্দর, যাহা কিছু সুরভি, তাহা তোমাতেই আছে। আইস, উভয়ে মিলন করিয়া দিয়া আমরা কৃতার্থ হই।”[১]

—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

১

‘খেয়া’র চার বছর পরে বাংলা ‘গীতাঞ্জলি’তে কবির প্রাণ ভগবানের উদ্দেশ্যে সম্পূর্ণরূপে নিবেদিত। ‘খেয়া’-তে কবির ভগবদনুভূতি এক নতুন রূপ দৃষ্ট হয়। তত্ত্বের উপলব্ধি এক রহস্যের অনুভূতিতে পরিণত হয়েছে। এখানে ভগবান তাঁর আলৌকিক মূর্তি ত্যাগ করে একাবারে লীলাময় হয়ে উঠেছেন। বলাবাহুল্য ‘খেয়া’ থেকেই রবীন্দ্রনাথের প্রকৃত মিষ্টিক কবিতার যাত্রা শুরু। ১৩১৭ সালে বাংলা ‘গীতাঞ্জলি’র বিজ্ঞাপন অংশে কবি বলছেন, ‘এই গ্রন্থের কয়েকটি গান পূর্বে অন্য দুই-একটি পুস্তকে প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু অল্প সময়ের ব্যবধানে যে-সমস্ত গান পরে পরে রচিত হইয়াছে তাহাদের পরস্পরের মধ্যে একটি ভাবের ঐক্য থাকা সম্ভবপর মনে করিয়া তাহাদের সকলগুলিই এই পুস্তকে একত্রে বাহির করা হইল।’ অবশ্য ‘গীতাঞ্জলি’-তেই এই ধারার ভাবনার অবসান হয়নি; ১৩২১ সালে সংযুক্ত হল ‘গীতিমাল্য’ এবং সেই বছরে ভাদ্র থেকে কার্তিক মাসে রচিত অবশিষ্ট কবিতাগুলি স্থান পায় ‘গীতালি’-তে। সব মিলিয়ে একটি পূর্ণ পরিমণ্ডল বলা যায়। একটা ভাবের ঘোর তখন কবিকে পেয়ে বসেছিল। সুতরাং আমরা বলতে পারি ‘গীতাঞ্জলি’র ১০৮ নং কবিতা বা গান ‘হে মোর দুর্ভাগা দেশ’ সেই ধারার ফসল। এই কবিতাটি আলোচনার পূর্বে গীতাঞ্জলিতে কবির অধ্যাত্মসাধনার মূল তত্ত্বকথাটি আমরা দেখে নিতে চাই।

চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এই কাব্যের তত্ত্ব আলোচনায় দেখিয়েছেন চারটি পর্বে ভাগ করে—“১) অহঙ্কার মিলনের বাধা। তাহাকে ধ্বংস করার সাধনা প্রথমেই অবলম্বনীয়। অহঙ্কারে বিশ্ব প্রতিহত, আনন্দ সঙ্কীর্ণ, প্রেম সঙ্কুচিত হয়। ২) সংসারে দুঃখ আঘাত বেদনার একটি বিশেষ সার্থকতা আছে। ইহারা প্রেময়ের দূতী ...। ৩) বিশ্বপ্রকৃতির ও নরসমাজের সর্বত্র ভগবানের সত্তা ও লীলা সাধক-কবি সন্দর্শন করিতেছেন। ... এই জগতের মধ্যে একটি শান্তিময় সামঞ্জস্য আছে, যাহার প্রভাবে সকল বিরোধ সকল অভাব মলিনতা অপূর্ণতা পূর্ণের স্পর্শে মহিমান্বিত হইয়া উঠে। ৪) অতএব সবার পিছে সবার নীচে সব-হারাদের মাঝে স্থান লইয়া মৃত্যু-মাঝে হ’তে হবে চিতাভস্মে সবার সমান!”[২] এই সারকথা আছে উক্ত গানে বা কবিতায়। রবীন্দ্র-সাধনার একটি পর্ব এই কবিতায় বিধৃত। এখানে

পটুয়া, তুষার : রবীন্দ্রনাথের ‘হে মোর দুর্ভাগা দেশ’
Open Eyes : Indian Journal of Social Science, Literature, Commerce & Allied Areas, Volume 22, No. 1, June 2025, Pages : 10-17, ISSN : 2249-4332

একদিকে কবির নিজের আত্মনিবেদন আছে অন্যদিকে দেশের দুর্দশায় সুতীব্র বেদনাবোধও আছে। সুখে দুঃখে মানে অপমানে কবি নিজের অনুভবের স্থানটি স্পষ্ট করেছেন বিচিত্র সুরে বিচিত্র তালে। কবি যেখানে তাঁর কাব্যপ্রেরণা লাভ করেছেন প্রেম ও আনন্দের অনুভূতির মধ্যে সেখানে কোনভাবেই তার অন্যথা দেখতে পারেননি। তাই জগতে প্রেম-প্রীতি ও আনন্দের অপমান কবির কাছে ভীষণ অসম্মানের বলে মনে হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জীবনব্যাপী সাহিত্যসাধনায় ও জীবনসাধনায় নিমগ্ন ছিলেন। সমাজ ও জীবনে যখন এবং যেখানেই তিনি বৌদ্ধিক বিকাশ ও মূঢ়তার পরিচয় পেয়েছেন সেখানে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণে সাহায্য করেছেন। রবীন্দ্রনাথ যথার্থই "জাগরণ' বলতে মনে করতেন মানুষের মোহমুক্ত বুদ্ধির জাগরণ, ক্ষুদ্র সংকীর্ণ নিষেধের শাসন থেকে মুক্তি, অনৈক্যবোধ থেকে মুক্তি ... এই মুক্তিকে স্বীকার করাতেই আমাদের গৌরব, অস্বীকারে মূঢ়তাই প্রকাশ পায়।"[৩] এই কথাগুলি কবি বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ভাবে আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। এই সময়ের কিছু আগে পরে রচিত গ্রন্থের দিকে দৃষ্টি দিলে দেখা যায়—১৩০৭ সালে ক্ষণিকার কবিতাগুলি লিখছেন, নৈবেদ্য প্রকাশিত হয় ১৩০৮ সালে আষাঢ় মাসে, স্মরণ-১৩০৯ সালে, শিশু-১৩১০, উৎসর্গ-১৩১০, খেয়া-১৩১৩ এবং তার পরেই গীতাঞ্জলি (১৩১৩-১৩১৭ সালের মধ্যে রচিত কবিতা)। নামের দিক থেকে পৃথক হলেও ভাবের দিক থেকে এরা পরস্পর অবিচ্ছিন্ন বলেই মনে হয়। এই পর্বে কবি দৃঢ় বিশ্বাস যে, মানুষ-রচিত সমাজে যারা অধঃপতিত, নির্যাতিত, লাঞ্ছিত, হীন, দরিদ্র, নিঃস্ব, সর্বহারা তাদের মধ্যেই প্রকৃত ভগবানের আসন।

২

'সীমার মাঝে অসীম তুমি বাজাও আপন সুর/আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ তাই এত মধুর।' কবির কাছে স্বদেশপ্রেম থেকে বিশ্বপ্রেমের অবাধ যাত্রা তাঁর লেখনীতে ধরা পড়েছে। ভারত শুধু তাঁর নিজের দেশ নয়, তা যেন মহামানবের মিলনক্ষেত্র। 'ভারততীর্থ' কবিতায় বলেছেন, 'হে মোর চিত্ত, পুণ্যতীর্থে জাগরে ধীরে/এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে।' ভারতবর্ষ রবীন্দ্রনাথের কাছে 'ভারততীর্থ' হিসেবে পরিগণিত হয়েছে যে পবিত্র তীর্থে পৃথিবীর নানা দেশ ও জাতির সম্মিলন ঘটেছে। আর এই ভারতের মধ্যে সবার অধম, দীনের থেকে দীন, যারা সকলের নীচে, সবার পিছনে থাকে, যারা অপমানিত ও নিপীড়িত তাদের জন্য করুণায় তাঁর হৃদয় বিগলিত হয়। মানুষকে শূদ্র ম্লেচ্ছ বলে মানুষের অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে। দেশের অর্ধেক মানুষকে নারী বলেই মানুষেরা অধিকারচ্যুত করে রেখেছে, সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত না করা অবধি তোমার ভারতপথও রুদ্ধ থাকবে, হে ভারত তোমাকেও অপমানিত হতে হবে এই অপমানিতের কাছে, অপমানিতের সমান হয়ে। সর্বোপরি কবি শুনিয়ে গেলেন 'মহামানবের' আবির্ভাব হচ্ছে তিনি কোনো অপার্থিব দেবতা নন; বিশ্বের সকল মানুষের দেবতা সর্বাধিনায়ক যিনি এসে সকলকে চমকে দেবেন। বিশ্বের সকল মানুষের কাছে থেকে, পাশে থেকে তিনি তাঁর বিশ্বমানবতার বাণী প্রচার করবেন। কবি বলেছেন, আবাল্যকাল উপনিষদ আবৃত্তি করতে করতে তাঁর মন বিশ্বব্যাপী পরিপূর্ণতাকে অন্তর্দৃষ্টিতে মানতে অভ্যাস করেছে। এর পাশাপাশি স্বদেশাভিমানও তাঁর হৃদয় ও মনকে সম্পূর্ণরূপে অধিকার করে রেখেছিল। ভারতবর্ষের ঐতিহ্যের বিবিধ পরম্পরা তাঁর ধ্যান ও কর্মসাধনায় অনুপ্রাণিত করেছে। রবীন্দ্রনাথের এই অনুভূতি সমস্ত সৃষ্টির মূলে প্রেরণাদান করেছেন। এই অনুভূতি জীবনের এক এক পর্যায়ে এক এক রকমের। এই পর্বে এসে আমরা দেখতে পাই মানবরূপী দেবতার অনুসন্ধানে ব্রতী রবীন্দ্রনাথ মানুষের হয়ে, মানুষের জন্যে নানান প্রশ্ন ও মীমাংসার সম্মুখীন হয়েছেন।

স্বদেশপ্রাণ কবি রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন তাঁর প্রিয় জন্মভূমি ভারতবর্ষ যেন একটা আদর্শের দৃষ্টান্ত হয়ে উঠতে পারে, জগৎ-সভায় সসম্মানে বাঙালি জাতি স্থান করে নিতে পারে। কবির কাছে স্বদেশ শুধু সমাজের উচ্চ স্তরের স্বদেশ নয় সকলের আগে স্থান পেয়েছে সর্বহারা, দুর্গত, দুর্ভাগাজনেরা। তাদের দুঃখ দুর্দশা বেদনার কথা বারবার ধ্বনিত হয়েছে কবির কণ্ঠে। এমনকি পরজাতির প্রতি ঘৃণা-বিদ্বেষের কোন স্থান ছিল না সেখানে। পরিবর্তে কবিহৃদয় পরিপূর্ণ ছিল সর্বজাতি ও সর্বস্তরের মানুষের কল্যাণ কামনায়। কবির লেখনীতে প্রকাশিত হয়েছে করুণা ও সমবেদনার বিগলিত ধারা। মানুষের প্রতি মানুষের অমানুষিক আচরণে ব্যথিত হয়েছেন, মানুষকে মানুষের হাতে অপমানিত হতে দেখে, লাঞ্ছিত হতে দেখে কবি মন দুঃখিত হয়েছে। যারা মূঢ় ম্লান মূক বধির শান্ত শুষ্ক ভগ্ন বুক তাদের লাঞ্ছনা-অপমান, বীভৎসতার গ্লানি কবিকে ব্যথিত করেছে, চঞ্চল করেছে। আমাদের সমাজে যারা আভিজাত্যের গর্বে গর্বিত এবং মোহাবিষ্টের ন্যায় মানুষের স্পর্শ এড়িয়ে চলে সচেতনভাবে 'বিধাতার রুদ্র রোষে' পড়ে তাদেরই মতো অপমানিত হতে হবে একদিন—

"হে মোর দুর্ভাগা দেশ, যাদের করেছ অপমান,
অপমানে হোতে হবে তাহাদের সবার সমান।
মানুষের অধিকারে
বঞ্চিত করেছ যারে,
সম্মুখে দাঁড়ায়ে রেখে তবু কোলে দাও নাই স্থান
অপমানে হোতে হবে তাহাদের সবার সমান।"

যে স্বদেশে কবি তাঁর বিশ্বদেবের প্রতিমূর্তিরূপী মানুষকে দেখেছেন, সেই স্বদেশ বিশ্বমানবের মিলনক্ষেত্র। এই স্বদেশে কবি যখন দেখেন যে, কৃত্রিম জাতিভেদের দ্বারা, শাস্ত্রের অপব্যাখ্যার দ্বারা মানুষই মানুষকে অস্পৃশ্য করে রেখেছে দূরে ঠেলে রেখেছে তখন তিনি ব্যথিত চিত্তে বলেন, 'মানুষের পরশেরে প্রতিদিন ঠেকাইয়া দূরে/ঘৃণা করিয়াছ তুমি মানুষের প্রাণের ঠাকুরে।' আমাদের সমাজে যারা আভিজাত্যের গর্বে অহংকারে অন্ধ হয়ে মানুষের স্পর্শ প্রতিদিন দূরে ঠেলে রাখে তাদের উদ্দেশ্যে কবির সাবধানবাণী উচ্চারণ করেছেন এখানে।

মানুষকে ঘৃণা করার প্রতিফল স্বরূপ ভগবানের হাত থেকে একদিন তাকে চরম শাস্তি গ্রহণ করতে হবে। 'বিধাতার রুদ্ররোষে/দুর্ভিক্ষের দ্বারে বসে/ভাগ করে খেতে হবে সকলের সাথে অন্নপান।' স্বদেশী আন্দোলনের যুগে রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন স্থানে স্বাদেশিকতার ও স্বজাতিকতার এই বাণী সমগ্র মানব সমাজকে শুনিয়েছেন। কবির দৃঢ় বিশ্বাস ভারতবাসীর স্বদেশপ্রেম ও স্বজাতিপ্রীতি বিকশিত হয়ে উঠবে ভারতের প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করেই। ভবতোষ দত্তের কথাতে জানতে পারি বৈদান্তিক চিন্তাপ্রবণতাই বাঙালি মনীষার আধুনিকতর রূপ। এই চিন্তাই রবীন্দ্রনাথের সংহতি-চিন্তার ভিত্তি।'[৪] আমরা জানি হিন্দু শাস্ত্রে তর্পণের বিধানে কথিত আছে, যে জলাশয়ের জল সকল প্রাণীর জন্য উৎসর্গীকৃত হয় নাই, তার দ্বারা তর্পণ হবে না। প্রাচীন ভারতের শিক্ষা "সর্বে ভবন্তু সুখিনঃ/সর্বে সন্তু নিরাময়া/সর্বে ভদ্রানি পশ্যন্তু/মা কশ্চিদ্দুঃখমাপ্নুয়াৎ" ক্ষুদ্রতা ও সংকীর্ণতা থেকে মনকে মুক্ত করে এবং সীমাবদ্ধ স্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠে বিশ্বজনকে সুখ-স্বস্তি-স্বাস্থ্য কামনা করবে। সুতরাং তিনি ভারতীয় ঐতিহ্যের গভীর ও শাশ্বত মর্মটি অনুধাবন করেছিলেন। সেই কারণে তার ভাবনার পরতে পরতে সংস্পৃষ্ট আছে চিরন্তন মানবিকতার ধর্ম। মানুষের মধ্যেই ভগবানের আসন। কবি আশা প্রকাশ করেন, 'গৃহের এবং পল্লির ক্ষুদ্র সম্বন্ধ অতিক্রম করিয়া প্রত্যেককে বিশ্বের সহিত যোগযুক্ত করিয়া অনুভব করিবার জন্য হিন্দুধর্ম পন্থা নির্দেশ

করিয়াছেন। হিন্দুধর্ম সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তিকে প্রতিদিন পঞ্চযজ্ঞের দ্বারা দেবতা, ঋষি, পিতৃপুরুষ, সমস্ত মনুষ্য ও পশুপক্ষীর সহিত আপনার মঙ্গলসম্বন্ধ স্মরণ করিতে প্রবৃত্ত করিয়াছে। ইহা যথার্থরূপে পালিত হইলে ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেকের পক্ষে ও সাধারণভাবে বিশ্বের পক্ষে মঙ্গলকর হইয়া উঠে।'[৫] 'আত্মশক্তি' প্রবন্ধের অন্তর্গত 'সফলতার সদুপায়' রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'জগতের ইতিহাসে সর্বত্রই দেখা গেছে, এক পক্ষকে বঞ্চিত করিয়া অন্য পক্ষের ভালো কখনোই দীর্ঘস্থায়ী হইতে পারে না। ধর্ম সামঞ্জস্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, সেই সামঞ্জস্য নষ্ট হইলেই ধর্ম নষ্ট হয় এবং ধর্ম এব হতো হন্তি ধর্মো রক্ষতি রক্ষিতঃ।' রবীন্দ্রনাথ থেকে আমরা জানি সত্যের পরিচয় দুঃখের দিনেই ভালো করে ঘটে। দুঃখ মানুষকে সত্যের পথে চালিত করে সত্যকে চিনতে সাহায্য করে। আর তখনই আমরা পীড়িতের জন্যে, দুর্বলের জন্যে, দুর্ভাগ্যের জন্যে কষ্ট অনুভব করতে পারি। এই সত্য উপলব্ধি কবি প্রত্যাশা করেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরবাড়ির মধ্যে প্রচলিত ধর্মীয় ভাবাবেগ বর্জিত পরিবেশ পেয়েছিলেন।[৬] রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'আমাদের বাড়িতে আর একটি সমাবেশ হ'য়েছিল সেটি উল্লেখযোগ্য। উপনিষদের ভিতর দিয়ে প্রাক্‌পৌরাণিক যুগের ভারতের সঙ্গে এই পরিবারের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। অতি বাল্যকালেই প্রায় প্রতিদিনই বিশুদ্ধ উচ্চারণে অনর্গল আবৃত্তি করেছি উপনিষদের শ্লোক। এর থেকে বুঝতে পারা যাবে সাধারণতঃ বাংলাদেশে ধর্মসাধনার ভাবাবেগের যে উদ্বেলতা আছে আমাদের বাড়িতে তা প্রবেশ করে নি।' তিনি আরও বলেছেন, "দেশ মানুষের সৃষ্টি। দেশ মৃণ্ময় নয়, সে চিন্ময়। মানুষ যদি প্রকাশমান হয় তবেই দেশ প্রকাশিত। সুজলা সুফলা মলয়জশীতলা ভূমির কথা যতই উচ্চকণ্ঠে রটাব ততই জবাব-দিহির দায় বাড়বে, প্রশ্ন উঠবে প্রাকৃতিক দান তো উপাদান মাত্র, তা নিয়ে মানবিক সম্পদ কতটা গ'ড়ে তোলা হোলো। মানুষের হাতে দেশের জল যদি যায় শুকিয়ে, ফল যদি যায় ম'রে, মলয়জ যদি বিষিয়ে ওঠে মারী বীজে, শস্যের জমি যদি হয় বন্ধ্যা, তবে কাব্যকথার দেশের লজ্জা চাপা প'ড়বে না। দেশ মাটিতে তৈরি নয়, দেশ মানুষে তৈরী।" এই মানুষকে অবহেলা করে বঞ্চিত করে এই সমাজ তাই কখনও অগ্রসর হতে পারে না। গোরা উপন্যাসে গোরা চরিত্রের সেই এক উপলব্ধি, 'আজ আমি সম্পূর্ণ অনাবৃত চিত্তখানি নিয়ে একেবারে ভারতবর্ষের কোলের উপরে ভূমিষ্ঠ হয়েছি। আমি আজ ভারতবর্ষীয়। আমার মধ্যে হিন্দু, মুসলমান, খ্রিষ্টান কোন সমাজের কোন বিরোধ নেই। আজ সকলের জাতই আমার জাত, সকলের অন্নই আমার অন্ন। আমাকে আজ সেই দেবতার মন্ত্র দিন যিনি হিন্দু, মুসলমান, খ্রিষ্টান সকলেরই যাঁর মন্দিরের দ্বার কোনো জাতের কাছে, কোনো ব্যক্তির কাছে কোনো দিন অবরুদ্ধ হয় না যিনি কেবলই হিন্দুর দেবতা নন ভারতবর্ষের দেবতা।'

মানুষই হল মানুষের শক্তি, বল, সহায় ও একমাত্র অবলম্বন। সেই শক্তিকে দূরে ঠেলে দিলে নিজেকেই শক্তিহীন হয়ে পড়তে হয়। কোন মানুষ একা নিজের মধ্যে পূর্ণ নয়; সকলের মধ্যে সকলের সঙ্গে আত্মিক যোগের সত্যতাতেই সে মানুষ সে সত্য। রবীন্দ্রনাথ 'সাহিত্যের পথে'তে বলেছেন, 'মানুষের পরিচয় তখনই সম্পূর্ণ হয় যখন সে যথার্থভাবে আপনাকে প্রকাশ করতে পারে। কিন্তু প্রকাশ তো একান্ত নিজের হতে পারেন না। প্রকাশ হচ্ছে নিজের সঙ্গে অন্য-সকলের সত্য সম্বন্ধ। ... এই ঐক্যকে ব্যাপক ক'রে গভীর ক'রে পেলেই আমাদের সার্থকতা।'[৭] এই গ্রন্থের ৩নং কবিতায় আছে, 'তোমারে জানিলে নাহি কেহ পর,/নাহি কোনো মানা, নাহি কোনো ডর;/সবারে মিলায়ে তুমি জাগিতেছ,/দেখা যেন সদা পাই।' কবি বলেছেন, 'যুক্ত করো হে সবার সঙ্গে,/মুক্ত করো হে বন্ধ, ...।' অহংকার সেই বোধের পথে বাধা সৃষ্টি করে। প্রেম জগতের সমস্ত দূরকে নিকটে করে দিতে পারে, এই প্রেমই পারে আমিত্বের অহংকারের ক্ষুদ্রতা থেকে মুক্ত করতে। তাই যেখানে প্রেম নেই সেখানেই দূরে ঠেলে ফেলা

আছে। দূরে সরিয়ে দিতে গিয়ে আমরা নিজেকেই তো দূরে নিয়ে যেতে থাকি। ১০৪ নং কবিতায় কবির আবেদন 'আমি চেয়ে আছি তোমাদের সবাপানে।/স্থান দাও মোরে সকলের মাঝখানে।/নীচে সব নীচে এ ধূলির ধরণীতে/যেথা আসনের মূল্য না হয় দিতে,।' কবির কাছে স্বদেশ বিশ্বদেবতার প্রতিরূপ হয়ে দেখা দিয়েছে। তাই এই ধরাভূমি তাঁর দৃষ্টিতে দেবালয় হয়ে উঠেছে যেখানে বিশ্বমানবের মিলনক্ষেত্র ও তীর্থস্থান। এখানে কেউ অনাদৃত অবহেলিত নয় সকলেই মানুষ, সকলের প্রথম ও শেষ পরিচয় মানুষ। ১৯ আষাঢ় ১৩১৭ সালে রচিত ১০৭ নং কবিতায় কবি বলেছেন, 'যেথায় থাকে সবার অধম দীনের হতে দীন/সেইখানে যে চরণ তোমার রাজে/সবার পিছে, সবার নীচে, /সব-হারাদের মাঝে।' সেখানে আরও আছে 'সঙ্গী হয়ে আছ যেথায় সঙ্গিহীনের ঘরে/সেথায় আমার হৃদয় নামে না যে/সবার পিছে, সবার নীচে/সব-হারাদের মাঝে।' ২০ আষাঢ়, ১৩১৭ ঠিক তার এক দিন পরেই ১০৮ নং কবিতায় কবি লিখেছেন, মানুষের পরশেরে প্রতিদিন ঠেকাইয়া দূরে/ঘৃণা করিয়াছ তুমি মানুষের প্রাণের ঠাকুরে।/' এবং 'তোমার আসন হতে যেথায় তাদের দিলে ঠেলে/সেথায় শক্তিরে তব নির্বাসন দিলে অবহেলে/... সেই নিম্নে নেমে এসো, নহিলে নাহি রে পরিত্রাণ।'

৩

জাতিভেদের দ্বারা, অস্পৃশ্যতার দ্বারা মানবজাতির প্রতি অবজ্ঞার দ্বার ভারতবর্ষ বহুযুগ ধরে যে অন্যায় পাপ করে এসেছে তারই ফলে বিশ্বসভায় সে অপাঙ্‌ক্তেয় হয়ে পড়েছে এই মর্মকথাটি কবি বারবার বিভিন্নভাবে আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। মানুষকে অপমান করে মানুষ কখনও বড়ো হতে পারেনি। মানুষের অধিকারে যারা বঞ্চিত তাদের সেই অসহনীয় অপমান কোন ধর্মেই সয় না। তিনি বলেছেন, 'যারে তুমি নীচে ফেল সে তোমারে বাঁধিবে যে নীচে/পশ্চাতে রেখেছ যারে সে তোমারে পশ্চাতে টানিছে।' ভারতের পুণ্য মানবতীর্থে নরদেবতাকে পরম প্রণতি না জানালে এই দুঃখ-দুর্গতির অবসান নেই। 'দেবতারে প্রিয় করি প্রিয়েরে দেবতা' এই যাঁর সাধনা তাঁর কাছে এই কথা বলাটা খুবই স্বাভাবিক। তাই এখানে স্মরণীয় ১০৬ নং কবিতাটি 'হে মোর চিত্ত, পুণ্য তীর্থে জাগো রে ধীরে/এই ভারতের মহামানবের/ সাগরতীরে।' বিশ্বজনের পায়ের তলায় যে ধূলিময় ভূমি পড়ে আছে সেই তো স্বর্গভূমি, সেই তো সকলের মহা মিলনক্ষেত্র। 'সবার নীচে, সবার মাঝে লুকিয়ে আছ তুমি/সেই তো আমার তুমি।' (গীতালি)

পৃথিবীতে সকল মানুষ ও সকল জাতির স্বভাবগত আদর্শ এক হয় না। সেই কারণে ক্ষোভ প্রকাশ করা যেমন অনর্থক তেমনি বোকামিও। অজ্ঞানের অনন্ত অন্ধকারে কাউকে ঠেলে ফেলে দিলে একদিন আমাকেও তার সমান হতে হবে। রবীন্দ্রনাথ 'সমাজ' প্রবন্ধে বলেছেন, "যাহা সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ, যাহা সকলের চেয়ে পূর্ণ, যাহা চরম সত্য, তাহা সকলকে লইয়া; এবং তাহাই নানা আঘাত-সংঘাতের মধ্য দিয়া হইয়া উঠিবার দিকে চলিয়াছে আমাদের সমস্ত ইচ্ছা দিয়া তাহাকেই আমরা যে-পরিমাণে অগ্রসর করিতে চেষ্টা করিব, সেই পরিমাণেই আমাদের চেষ্টা সার্থক হইবে; নিজেকেই ব্যক্তি হিসাবেই হউক আর জাতি হিসাবেই হউক জয়ী করিবার যে চেষ্টা, বিশ্ববিধানের মধ্যে তাহার গুরুত্ব কিছুই নাই।" তিনি আরও বলেছেন, 'আমরা বৃহৎ ভারতবর্ষকে গড়িয়া তুলিবার জন্য আছি। আমরা তাহার একটা উপকরণ। উপকরণ যদি এই বলিয়া বিদ্রোহ প্রকাশ করিতে থাকে যে, আমরাই চরম, আমরা সমগ্রের সহিত মিলিব না, আমরা স্বতন্ত্র থাকিব, তবে সকলের হিসাবেই ব্যর্থ হয়। ... ভারতবর্ষেরও যে-অংশ সমস্তের সহিত মিলিতে চাহিবে না, যাহা কোনো-একটা বিশেষ অতীত কালের অন্তরালের মধ্যে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া

অন্য-সকল হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকিতে চাহিবে, যে আপনার চারিদিকে কেবল বাধা রচনা করিয়া তুলিবে...।'

'শতেক শতাব্দী ধরে নামে শিরে অসম্মানভার,/মানুষের নারায়ণে তবুও কর না নমস্কার।' বহুকাল থেকে দেখা যায় মানুষ মানুষের দ্বারা যেভাবে অপমানিত হয় লাঞ্ছিত হয়; সেইরকম অপমান ও লাঞ্ছনা আর কোথাও সে পায় না। পূর্ণজাগ্রত মানুষের জীবন্ত সত্তার সন্ধান করতে গিয়ে কবি ভগবানের সাক্ষাৎ পান। অজিতকুমার চক্রবর্তী বলেছেন, 'রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিক সাধনা কোনো বাইরের সংস্কারকে অবলম্বন করে নাই, তাহা তাঁহার সমস্ত জীবনের ভিতর হইতে উদ্ভূত হইয়াছে, তখন একথা বুঝিতে হইবে যে, জীবনের সকল বিচিত্রতাকে পরিপূর্ণ একের মধ্যে পাইবার আকাঙ্ক্ষাই কবির পরিণত জীবনে কাজ করিতেছে।'[৮] তাই কবির মন্তব্য, 'তবু নত করি আঁখি/দেখিবারে পাও না কি/নেমেছে ধূলার তলে হীন পতিতের ভগবান, ...।' প্রমথনাথ বিশী বলেছেন, 'রবীন্দ্রনাথ কাব্যে কখনো ভগবানের সন্ধান করেন নাই, মানুষকে খুঁজিতে গিয়া ঈশ্বরের সন্ধান মিলিয়াছে। কিন্তু ভগবানের এই মনুষ্য বিরহিত সত্তাতে তিনি সন্তুষ্ট না হইয়া আরও অগ্রসর হইয়া গিয়াছেন। এই প্রাগ্রসর গতি তাঁহাকে মানুষের দ্বারে উপস্থিতি করিয়াছে, সেখানে ভগবানেরও সাক্ষাৎ ঘটয়াছে।'[৯]

'গীতাঞ্জলি'র ১নং গানে কবি বলেছেন, "সকল অহংকার হে আমার/ডুবাও চোখের জলে!" আমাদের মধ্যে অহংকারের প্রাবল্য যতক্ষণ জাগ্রত; ততক্ষণ আমরা বিশ্বের সকলের সঙ্গে এবং ভগবানের সঙ্গে মিলিত হতে পারবই না। কারণ 'নিজেরে করিতে গৌরব দান/নিজেরে কেবলি করি অপমান,/আপনারে শুধু ঘেরিয়া ঘেরিয়া/ঘুরে মরি পলে পলে।' 'গীতিমাল্য'-এর ৫৮ সংখ্যক কবিতায় আছে, 'বেসুর বাজে রে/আর কোথা নয় কেবলি তোরি/আপন-মাঝে রে।' মানুষের মধ্যে যে অহংকারের অবস্থান সেখানেই সমস্ত বেসুর বাজে এখানেই অপমান, অভিশাপ। সমগ্র জাতির অহংকারে এইভাবে সীমারেখা ও একই সঙ্গে ভেদরেখা অঙ্কিত হয়ে যায়। এই অহং নামক বস্তুটিকে বিসর্জন দিতে না পারলে আমাদের কারুরই মুক্তি নেই। কবি বলছেন, 'দেখিবারে পাও না কি/নেমেছে ধূলার তলে হীন পতিতের ভগবান,'। সর্বহারাদের মাঝে অপমানের তলদেশে ভগবানের চরণ পড়েছে 'দেখিতে পাও না তুমি মৃত্যুদূত দাঁড়ায়েছে দ্বারে' সেইখানে তাঁকে প্রণাম না করলে আর প্রণাম করাই হবে না। তাই কবির উক্তি এখানে স্মরণীয় 'মৃত্যুমাঝে হবে তবে চিতাভস্মে সবার সমান।' অর্থাৎ বিমুখ হবো, বিচ্ছিন্ন থাকবো স্পর্শ এড়িয়ে যাবো এই অহংকার ত্যাগ না করলে আমরা নিজেরাও একদিন বিচ্ছিন্নতার দিকে অপমানিতের দিকে চলে যাবো। সর্বোপরি সমাজে স্পর্শ এড়িয়ে গেলেও চিতাভস্মে পৃথক করা অসম্ভব। সমাজকে গড়ে তুলতে হলে তাই অহংকার ও অসামঞ্জস্যকে দূর করতে হবে। যতদিন আমরা আমাদেরকে অবজ্ঞা করবো, ততদিন আমরাও পিছিয়ে থাকবো। রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য 'ভারতবর্ষ আজ সকল দিক হইতে শাস্ত্রে ধর্মে সমাজে নিজেকেই নিজে বঞ্চনা ও অপমান করিতেছে; নিজের আত্মাকেই সত্যের দ্বারা ত্যাগের দ্বারা উদ্‌বোধিত করিতেছে না, এইজন্যই অন্যের নিকট হইতে যাহা পাইবার তাহা পাইতেছে না।'

মানুষের প্রতি গভীর মমত্ব কবির স্বীকারোক্তিতে স্পষ্ট, "আমি ভালোবেসেছি এই জগৎকে, আমি প্রণাম করেছি মহৎকে, আমি কামনা করেছি মুক্তিকে, যে মুক্তি পরমপুরুষের কাছে আত্মনিবেদনে, আমি বিশ্বাস করেছি মানুষের সত্য সেই মহামানবের মধ্যে যিনি সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ। আমি আবাল্য-অভ্যস্ত ঐকান্তিক সাহিত্য-সাধনার গণ্ডীকে অতিক্রম করে একদা সেই মহামানবের উদ্দেশ্যে যথাসাধ্য আমার কর্মের অর্ঘ্য আমার ত্যাগের নৈবেদ্য আহরণ করেছি তাতে বাইরে থেকে যদি বাধা পেয়ে থাকি অন্তরের থেকে পেয়েছি প্রসাদ। আমি এসেছি এই ধরণীর মহাতীর্থে এখানে সর্বদেশ সর্বজাতি ও সর্বকালের ইতিহাসের মহাকেন্দ্রে আছেন নরদেবতা তাঁরই বেদীমূলে

নিভৃতে বসে আমার অহংকার আমার ভেদবুদ্ধি স্খালন করবার দুঃসাধ্য চেষ্টায় আজও প্রবৃত্ত আছি।"[১০]

কবি 'কড়ি ও কোমল'-এ বলেছেন মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে,/মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।' মানুষের মধ্যে বেঁচে থাকার বাসনা এই পর্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ আবেদন। বাংলা গীতাঞ্জলির এই কবিতায় কবির সাধনার ধারার এইরকম সুস্পষ্ট রূপ প্রত্যক্ষ করা যায়। কবি প্রবৃত্তির ক্ষুদ্র গণ্ডী অতিক্রম করে তাঁর ভাবনা মানুষের মধ্যে তথা বিশ্বের মধ্যে ব্যাপ্ত করে দিয়েছেন। এই পর্যায়ের কবিতাগুলিতে কবিহৃদয়ের অন্তরতম অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধিগুলি ক্রমপরম্পরায় প্রকাশের এই সরলরৈখিক যাত্রা আমরা দেখতে পাই। কবির আধ্যাত্মিক সাধনা ও বাসনার নবতর রূপ পরিদর্শন করে আমরা তাই বিস্মিত হই। সমস্ত প্রকৃতিকে, সমস্ত মানবসমাজকে আপনার করে পাওয়া ও আপনার চৈতন্যে অখণ্ড পরিপূর্ণ করে অনুভব করার নামই তো সর্বানুভূতি। এই সর্বানুভূতি কবির জীবনে ও কাব্যে সর্বত্র পরিব্যাপ্ত ও প্রত্যক্ষ।

কথাশেষ

রবীন্দ্রনাথ বাংলার কবি, রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষের কবি, রবীন্দ্রনাথ সর্বদেশের ও সর্বকালের মানুষের শ্রেষ্ঠ কবিদের মধ্যে অন্যতম। তাঁর সাধনা মানবরসের সাধনা। তাঁর বাণী ছিল বিশ্বজনীন, প্রেম ছিল সর্ব্যাপী, অন্তর্দৃষ্টি ছিল সুগভীর। তাঁর কবিতার মূল সুর ছিল শান্তিময় বিশ্বপ্রেম মানুষের জীবনে যে কাম্যবস্তু। এই অধ্যাত্ম অনুভূতিই সমগ্র রবীন্দ্র-জীবন ও সাহিত্যকে নিয়ন্ত্রিত করেছে। কবির একমাত্র ভালোবাসার প্রিয়পাত্র ছিলো মানুষ। সর্বসংস্কারমুক্ত মুক্ত হৃদয়ের উদার মানুষ রবীন্দ্রনাথ মানবাত্মার আত্মানুসন্ধানের বেদীতেই চিরকাল অর্ঘ্য প্রদান করেছেন। আলোচ্য কবিতায় দেখতে পাই কেমন করে কবিহৃদয় অহংকার ত্যাগ করে, দুঃখ-বেদনার দাহে হৃদয়কে পুড়িয়ে নির্মল করে, বিচিত্র আত্মদ্বন্দ্বের মধ্যে দিয়ে অগ্রসর হয়ে পরিপূর্ণ ভগবদুপলব্ধির দিকে যাত্রা করেছেন! রবীন্দ্রনাথ এখানে দেখাতে চাইছেন মানব-চৈতন্যের ক্রমোন্নতির ফলে মানুষের মন বহির্জগৎ ও আত্মজ্ঞানে সমৃদ্ধ হয়ে উঠছে। জীবকে এক নতুন ও গভীরতর দৃষ্টিকোণ বিচার ও বিশ্লেষণ করে দেখবার সময় উপস্থিত হয়েছে। কাব্যের ধ্যানলব্ধ আলোক ও ছন্দ সেই বার্তাকে সূচিত করে। জীবনের পরিপূর্ণ ও সামগ্রিক বিচারে আমরা যে দিকগুলি ভেবে দেখার অবকাশ পাইনা কবির বাণী সে অন্ধকারের মধ্যে আলোর সন্ধান দিতে পারে। মানবাত্মার সমস্ত ক্ষমতার প্রয়োগ করে জীবনকে সুন্দরতর করে গড়ে তোলার সাধনা কবির কাব্যের একটি সাধারণ প্রবণতা ও সাধনা। মানুষের মনের ক্ষেত্রকে, চেতনার পরিধিকেই কবি বিস্তৃততর করে দিয়েছেন সর্বত্র।

কবি বলেছেন,

"ওরা অন্ত্যজ, ওরা মন্ত্রবর্জিত। ...
কবি আমি ওদের দলে
আমি ব্রাত্য, আমি মন্ত্রহীন,
দেবতার বন্দীশালায়
আমার নৈবেদ্য পৌঁছল না।"

কবির আবেদন,

"তাকে বলেছি হাত জোড় করে
হে চিরকালের মানুষ, হে সকল মানুষের মানুষ,

পরিত্রাণ করো
ভেদচিহ্নের-তিলক-পরা
সংকীর্ণতার ঔদ্ধত্য থেকে।"

টীকাসূত্র :

১. রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশ্যে-তে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীগু্০৯ এই মন্তব্য করেছেন। দ্র. রবীন্দ্র বিচিত্রা, বিশ্বনাথ দে, পৃ. ৭।

২. রবি-রশ্মি (২য়)-চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, এ মুখার্জী এণ্ড কোং, ১৩৪৬, পৃ. ৯৯।

৩. রবীন্দ্রসমীক্ষা গ্রন্থের 'রবীন্দ্রনাথের মানবধর্ম' প্রবন্ধে সমালোচক অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় এই মন্তব্য করেন।

৪. ঐতিহ্য ও রবীন্দ্রনাথ, ভূমিকা অংশে, পৃ. ৭।

৫. আত্মশক্তি, রবীন্দ্র রচনাবলী-১৪, পঃ বঙ্গ বাংলা আকাদেমি, পৃ. ৪৮৫।

৬. বিচিত্রা ৫ম বর্ষ ২য় খণ্ডে, 'প্রতিভাষণ' পৃ. ১৫।

৭. সভাপতির অভিভাষণ, পৃ. ১৬৫।

৮. রবীন্দ্রনাথ-অজিতকুমার চক্রবর্তী, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ১৩৬৭, পৃ. ১৭।

৯. রবীন্দ্র-কাব্যপ্রবাহ-প্রমথনাথ বিশী, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৩৯, পৃ. ৫৪।

১০. কবির সপ্ততিত জয়ন্তী উপলক্ষ্যে ছাত্র-ছাত্রীদের সংবর্ধনার উত্তরে এই প্রতিভাষণটি পাঠ করেন।

তুষার পটুয়া
সহযোগী অধ্যাপক
বাংলা বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়,
পশ্চিমবঙ্গ।

ভাষার বৈচিত্র্যে বাউল

কৃষ্ণা মাখাল

গান হল বাউলদের প্রধান পরিচয়। এই গানের মধ্য দিয়ে বাউলদের সাধনভজন প্রণালী সম্পর্কে জানা যায়। প্রখ্যাত বাউল বিশেষজ্ঞ সুধীর চক্রবর্তীর মতে, বাউলকে কোন প্রশ্ন করলে উত্তরে তিনি একটি গান শোনান। গান গেয়ে উত্তর দেওয়াতে তাদের স্বকীয়তা বজায় থাকে। সম্প্রতি বাউল নিয়ে এক সমৃদ্ধ বাউল সাহিত্য গড়ে উঠেছে। বর্তমান সাহিত্য ও সংগীতে বাউল এক স্বতন্ত্র স্থানের অধিকারী। সুর ও বানীর মতো বাউল গানের ভাষা ও স্বতন্ত্র। এর ভাষা বৈশিষ্ট্য অন্যান্য গানের থেকে পৃথক। বাউল গান বাংলার নিজস্ব ঐতিহ্য বলে এই গানে বাংলার রূপ অকৃত্রিমভাবে ধরা পড়ে। বাউল গানে ছন্দ মিল থাকলেও এর ভাষা প্রায় বাংলা গদ্যের কাছাকাছি। গদ্যধর্মী সরল ভাষায় বাউল গানগুলি রচিত, তা সত্ত্বেও একথা বলা দরকার যে, এই গানের ভাষা হল রূপক প্রতীকের, এই গানের মাধ্যমে আধ্যাত্মবাদের অনেক গুহ্য রহস্য প্রকাশিত হয়। এই গুহ্যতত্ত্ব বাউলেরা ভক্ত বা শিষ্য ছাড়া কারো কাছে প্রকাশ করেন না। বাউলেরা বাংলা গানের জগতে তাদের নিজস্ব ভাব, ভাষা ও সুরের সমন্বয়ে এমন এক পরিবেশ সৃষ্টি করেছেন যাতে বাউল ব্যতীত আর কারোর প্রবেশাধিকার নেই।

সাহিত্য জগতে বাউল গান বাংলার একটি বিশেষ সম্পদ। বাউল গানের পূর্ণবিকাশ বাউল শ্রেষ্ঠ লালন ফকির শাহর (১৭৭৫-১৮৯১) সময় থেকে দেখা গেলেও এর সূচনা আরো অনেক পূর্বেই হয়েছিল। বাউল সম্প্রদায়ের ইতিহাস অন্ধকারে আচ্ছন্ন। এরা সবাই নিম্ন শ্রেণীর নিরক্ষর লোক। কিন্তু দৃষ্টির গভীরতায় ও প্রকাশের অপূর্বতায় অতুলনীয় এদের শক্তি। নানা স্থানে নানাভাবে বাউলদের প্রতি রবীন্দ্রনাথ গভীর শ্রদ্ধা সর্বদা প্রকাশ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ এদের গান দেখে বলেন—

> "এমন সহজ এমন গভীর, এমন সোজাসুজি সত্য এত অল্প কথায় এমন অপূর্ব ভাবে প্রকাশ করিবার শক্তি আমাদেরও নাই। আমার তো ইহাদের রচনা দেখিয়া রীতিমত হিংসা হয়।"[১]

বাউল গানের উদ্ভব সম্পর্কে সঠিক কোন তথ্য পাওয়া যায় না। অনুমান করা যায় যে, পঞ্চদশ শতকে কি তারও আগে থেকেই এই গান বাংলায় প্রচলিত ছিল। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে যে সকল গ্রন্থে এই শব্দের উল্লেখ আছে সেগুলি হল—মালাধর বসু 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' (১৫৭৩-১৫৮০) কাব্য, কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'শ্রীশ্রী চৈতন্য চরিতামৃত' (১৫৮০-১৫৮১) কাব্য এবং শ্রীরূপ গোস্বামীর 'বিদগ্ধ মাধব' (১৬১৫) নাটক, এর পরবর্তীকালে বাহারান খাঁ এর রচিত 'লায়লা মজনু' নাটকে বাউল শব্দের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' কাব্যে বাউল শব্দটির ব্যবহার নিম্নরূপ—

> মুকুল মাথায় চুল ন্যাংটা যেন বাউল
> রাক্ষসে রাক্ষসে বুলে বনে।
> বিকটান কড়ি রায় বলে মাংস কাড়ি খায়
> রক্ত পড়ে গলিয়া বদনে।[২]

মাখাল, কৃষ্ণা : ভাষার বৈচিত্র্যে বাউল
Open Eyes : Indian Journal of Social Science, Literature, Commerce & Allied Areas, Volume 22, No. 1, June 2025, Pages : 18-25, ISSN : 2249-4332

এরপর 'বাউল' শব্দের প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায় কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'শ্রীশ্রী চৈতন্য চরিতামৃত' (১৫৮০-১৫৮১) জীবনী কাব্যে। এই রচনাটি বৈষ্ণব দর্শনের একটি আকর গ্রন্থ। এতে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন প্রসঙ্গে বাউল শব্দটি বেশ কয়েকবার ব্যবহার হয়েছে। যথা—

আমিও বাউল আন কহিতে আর কহি,
কৃষ্ণের মাধুর্য স্রোতে ভাসি যাই বহি।

শ্রীরূপ গোস্বামীর সংস্কৃত ভাষায় রচিত 'বিদগ্ধ মাধব' (১৬১৫) নাটকে বাউল শব্দের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। এই নাটকটি মূল সংস্কৃত থেকে বাংলায় অনুবাদ করেন রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন মহাশয়। এই নাটকে 'বাউল কিণ্ডি নিরগগলং পলকরি'। এর অর্থ 'ওরে বাউল কেন অনর্গল প্রলাপ বকছিস?'

চণ্ডীদাসের ভনিতাযুক্ত বৈষ্ণব সহজিয়া তত্ত্ব ও সাধন প্রণালী সমন্বিত রাগাত্মিকা পদের মধ্যেও বাউল শব্দটির ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়।

শুন মাতা ধর্ম মতি বাউল হইনু অতি
কেমনে সুবুদ্ধি হবে প্রাণী।

দেখা যাচ্ছে সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ পর্যন্ত বাউল শব্দটি কোন নির্দিষ্ট ধর্ম সম্প্রদায়ের লোককে বোঝাতে বাংলা ভাষায় প্রবেশ করেনি। মনে হয় সংস্কৃত 'বাতুল' (অর্থাৎ উন্মাদ শব্দের প্রকৃত রূপ নিয়ে 'বাউল' শব্দটি বাংলা ভাষায় প্রবেশ করেছে। এই মূল বাতুল অর্থাৎ উন্মাদ ভাব উন্মাদ অর্থ থেকে পরবর্তীকালে একটি বিশিষ্ট ভাবের আবেগে বাহ্য জ্ঞানশূন্য বা ভাব উন্মাদ বা ধর্ম উন্মাদ উদাসীন ধর্ম সাধকগণ বাউল নামে পরিচিত হয়েছে।

চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন—

> "একটি বিশেষ ধর্মের লোকদিগকে বাউল বলে। এই শব্দের ব্যুৎপত্তি সম্পর্কে নানাজনে নানা মত প্রকাশ করিয়া থাকেন। কেহ বলেন 'বাউল' শব্দটি বায়ু শব্দের সহিত আছে এই অর্থদ্যোতক 'ল' প্রত্যয় যোগ করিয়া নিষ্পন্ন এবং এই বায়ু শব্দের অর্থে যোগশাস্ত্রের স্নায়বিক শক্তির সঞ্চার বোঝায়। যে সম্প্রদায় দেহের স্নায়বিক শক্তির সঞ্চার সাধন করিবার সাধনা করেন, তাহারা বাউল। কেউ বলেন বায়ু মানে শ্বাস-প্রশ্বাস এবং শ্বাস-প্রশ্বাস অর্থ জীবনধারণ এবং তাহা সংরোধ করিয়া দীর্ঘ জীবন লাভ করিবার সাধনা করেন যাহারা তাহারা বাউল। আবার কেহ বলেন, সংস্কৃত বাতুল শব্দের প্রাকৃত রূপ বাউল। যাহারা বাতাধিক তাহারা পাগল, যাহাদের আচরণ সাধারণের তুল্য নহে, লোকে তাহাদিগকে পাগল বা বাতুল বলে। এরূপ সাধারণ সমাজ বহির্ভূত আচার ব্যবহার সম্পন্ন ধর্ম সম্প্রদায় বাউল।"

বাউল গান আমাদের বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত। পূর্ববঙ্গে অতিরিক্ত মুসলিম প্রভাবের ফলে এই গানগুলিতে সুফি প্রভাব অতিরিক্ত মাত্রায় দৃষ্ট হয়। পূর্ববঙ্গে ঝড়ঝঞ্ঝা ও নদী মাতৃকতার প্রভাবে বাউল গানগুলি এই অঞ্চলে 'মারফতি' বা 'মুর্শিদা' গান নামে পরিচিত। 'মুর্শিদ' মানে গুরু বা পীর 'মুর্শিদা' গান মূলত ভাবপ্রধান মুর্শিদের প্রতি ভক্তের করুণ আর্তি মুর্শিদা গানের বিষয়বস্তু। পূর্ববঙ্গে বাউল সম্প্রদায় ফকির নামে পরিচিত। লালন ফকির, পাঁচু শাহ, দাদ্দু শাহ, হাসান রাজা প্রমুখ পূর্ববঙ্গের বিখ্যাত কয়েকজন বাউল সাধক। পশ্চিমবঙ্গের এই গানগুলি বাউল গান বলে কথিত হয়। সাধারণভাবে বাংলায় এই গানগুলিকে ভাবের গান বলা হয়। যে পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে থেকে বাংলার এই ভাবের গানগুলি জন্মলাভ করেছে তার বিশিষ্ট ছাপ এই গানগুলি বহন করে চলেছে। ফলে স্থান

বিশেষে এই গানগুলি ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত। এই গানগুলির অন্তর্নিহিত সুর এক হলেও স্থান বিশেষের পার্থক্যহেতু ভাষাগত এবং তত্ত্বগত কিছু সূক্ষ্ম পার্থক্য দৃষ্ট হয়। উত্তরবঙ্গ প্রাচীনকাল থেকেই তান্ত্রিকতার প্রভাবে ভরপুর তাই এই অঞ্চলে দেহতত্ত্ব মূলক গানগুলিতে অপরিণত তান্ত্রিক যোগ ও পরবর্তী সময়ে বৈষ্ণব ও সুখী প্রভাব প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়।

শম্ভুক এর মত আত্ম সংকোচনশীল স্বভাব বাউলদের তারা তাদের কথা তাদের সাধনার আনুষঙ্গিক কর্ম তাদের উদ্দেশ্য ঘুণাক্ষরেও তারা তা অন্যদের জানতে দেয় না। বাউলরা তাদের সাধন ভজন সংক্রান্ত সমস্ত কলা কৌশল, ভক্তি বিশ্বাস, স্রষ্টার কাছে আবেদন নিবেদন, সমস্ত কিছুই আকার ইঙ্গিতে তারা গান বিবৃত করে। বাউল ভাবাপন্ন মানুষ ছাড়া এসব গানের মর্ম উদ্ধার করা সম্ভব নয়। বাউলরা এই জন্যই তাদের গানে নিজস্ব পরিভাষা তৈরি করেছেন। তারা শুধু তাদের সাধন ভজনের পরিভাষা তৈরি করেই ক্ষান্ত হননি। বৌদ্ধ, হিন্দু, নাথ সুফি, বৈষ্ণব প্রভৃতি সাধক সম্প্রদায়ের সাধন মার্গের পরিভাষাগুলিও তারা আত্মস্থ করেছে। বাউলদের ব্যবহৃত কয়েকটি পরিভাষা হলো 'আরশিনগর', 'চরণদারি', 'বাবার পুকুর', 'ভূতের বোঝা', 'মানুষ ধরা' ইত্যাদি। 'বাংলার বাউল ও বাউলগান' গ্রন্থ থেকে পাচ্ছি—

আমি একদিনও না দেখিলাম তারে
আমার বাড়ির কাছে আরশিনগর
ও এক পড়শী বসত করে।

বাউলরা তাদের সাধন ভোজনের কথা রূপক ও প্রতীকের সাহায্যে আড়াল করে রেখেছে। আধ্যাত্ম সাধক সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি বোধ কাজ করে তা হলো সাধন ভজন মূলত গুপ্ত বিষয় এই গুপ্ত বিষয়ের ভেদকথা ব্যক্ত করা সমীচীন নয়। আধুনিক প্রতীকধর্মী সাহিত্যের আদিরূপ চর্যাপদ। চর্যার ভাষার মধ্যে যা বলা হলো তার চেয়ে বেশি কথা রয়ে গেল অনুচ্চারিত। এই অনুচ্চারিত কথার ব্যঞ্জনাই হলো চর্যার আসল সৌন্দর্য। চর্যার বিষয়বস্তুর সাংকেতিকতার সাথে বাউল গানের সম্পর্ক অতি গভীর। চর্যার কবিগণ তত্ত্বকে প্রতীকের সাহায্যে আড়াল করতে গিয়ে জ্ঞাত ও অজ্ঞাতসারে সাধারণ বাঙালির জীবন চিত্র অঙ্কন করেছেন। বাউলরা তাদের গানে তত্ত্বকে আড়াল করেছে কৃষিনির্ভর সমাজ ব্যবস্থার উপাদানের সাহায্যে। তারা সাধারণ বাঙালির জীবন থেকেই চিত্রকল্প ব্যবহার করেছেন। একটি দৃষ্টান্ত দিই—

বাঁকা নদীর পিছল ঘাটে পার হবি কি করে রে।
সেথা দেখলে ছবি, অবাক হবি, যাবি দু'বাপ বেটা।

বাউল পদকর্তাগণ এমনভাবে রূপক ও সংকেতময় শব্দ প্রয়োগ করেছে যার ফলে গানগুলো কোথাও ব্যর্থক অর্থ প্রকাশ করেছে। গানগুলোর কায়া নির্মাণের ক্ষেত্রে রূপক ও সংকেতের আশ্রয় নেওয়া হয়েছে। এই গানগুলো বাইরের দিক থেকে এক অর্থ প্রকাশ করে কিন্তু ভেতরে থাকে অন্য গুড়ার্থ যা একান্তই গুহ্য এগুলি নির্দিষ্ট সাধন মার্গের বিশিষ্ট অর্থ বহন করে।

চর্যাপদ বাংলা ভাষার প্রথম গান, আর বাউল গান চর্যাপদের আধুনিক সংস্করণ। তবে চর্যাপদ ও বাউল গানের মধ্যে পার্থক্য আছে। চর্যাপদ শুধু বৌদ্ধ সহজিয়া ধর্মমতের সাধন বিষয়ক গান আর বাউল গান হলো বৌদ্ধ, হিন্দু, নাথ, বৈষ্ণব ও সুধী ধর্মমতের মিশ্রণ। বাউল গানে বহু পারিভাষিক শব্দ চর্যাপদ ও নাথ সাহিত্য থেকে গৃহীত হয়েছে। বৈষ্ণবীয় ঐতিহ্যের ও সুফি সাধনার বহু পারিভাষিক শব্দ বাউল সংগীতে প্রবেশ করেছে। সেই সমস্ত ধর্মের ছাপ বাউল মতের মধ্যে দেখা যায়। সেই সমস্ত ধর্মগত পরিভাষা বাউলরা প্রয়োজনে ব্যবহার করে থাকে। ধর্মগত পরিভাষা

প্রয়োগের ক্ষেত্র ব্যতীত তারা অসাম্প্রদায়িক চেতনার পরিচয় দিয়েছে। বাউলরা আল্লাহ ও ভগবানের প্রতিশব্দ হিসেবে সাঁই, দয়াল নিরঞ্জন প্রভৃতি নিরপেক্ষ শব্দ ব্যবহার করেছে। বাউলদের গানে আলাপ আলোচনায় ও পারিবারিক জীবনে যে সকল পরিভাষা ব্যবহৃত হয় তার কিছু নমুনা দেওয়া হল। বাউল ফকিরদের গানেও এসব পরিভাষা ব্যবহৃত হয়। তৎসম, আরবি ফারসি ও ব্যুৎপত্তিহীন দেশী শব্দের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। এর মধ্যে দেহকেন্দ্রিক শব্দের প্রাধান্য বেশি পাওয়া যায়।। এছাড়া তান্ত্রিক শব্দেরও ব্যবহার দেখা যায়। ধর্মীয় শব্দের ক্ষেত্রে হিন্দু মুসলমান ও বৌদ্ধ ধর্ম নির্বিশেষে মূল বা আংশিক শব্দ ব্যবহারে এদের উদারতা রীতিমতো বিস্ময়কর। এইভাবে পঞ্চতত্ত্ব / পঞ্চবেনা, জিকির /নাম জপ, ষটচক্র / ছয় লতিফা শুরু প্রণামী / গুরু নজরানা, সাঁই / গুরু, সেবাদাসী / ক্ষেপী (দেশি শব্দ), গুরু / মুর্শীদ, সাঁই / নিরঞ্জন প্রভৃতি শব্দের যুগ্ম ব্যবহারেও বিষয়টি স্পষ্ট হয়। সুধীর চক্রবর্তীর 'বাউল-ফকির কথা' এমনই তথ্য দিচ্ছে।

সাধক বাউল এবং গীতিকার বাউলরা এই বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করেছেন এবং এই বাংলার বিভিন্ন স্থানে তাদের সাধন ক্ষেত্র। সুধীর চক্রবর্তী তার 'বাউল ফকির কথা' গ্রন্থে বলেছেন—

> "সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের জেলাওয়ারি সমীক্ষা করলে মোটামুটি কয়েকটি অঞ্চলে বাউলদের স্বাভাবিক বংশানুক্রমিক হাল হদিশ মেলে। কোনোও কোনোও জেলায় বাউল পাওয়া দুর্লভ। যেমন, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং, দিনাজপুরের অনেকটা, হাওড়া, দক্ষিণবঙ্গ হুগলী ও উত্তর ২৪ পরগনায় বাউল সাধক প্রায় নেই। সাধক বাউল ও ফকির এখনো নদিয়া-মুর্শিদাবাদে সবচেয়ে বেশি।"

বাউল বলতে 'বীরভূমের বাউল' শব্দবন্ধটি কিংবদন্তীর মত প্রসিদ্ধ। এই প্রসিদ্ধির একটা বড় কারণ স্থান মাহাত্ম্য একদিকে জয়দেব-কেন্দুলীর মেলা, আরেক দিকে শান্তিনিকেতনের পৌষ মেলা। তাই স্থানবিশেষে বাউল সাধক ও গীতিকারদের রচিত বাউল গানে আঞ্চলিক ভাষার প্রভাব পড়েছে। বীরভূম, বাঁকুড়া, নদিয়া, বর্ধমান, মুর্শিদাবাদ রাঢ় অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত এই অঞ্চলের উপভাষা রাঢ়ী উপভাষা, তাই স্বাভাবিকভাবেই এদের লেখ্যভাষার উপর এই উপভাষার প্রভাব পড়েছে।

হাওড়ে গোঁসাই বর্ধমান জেলার অন্তর্গত মেড়তলায় জন্মগ্রহণ করেন ১২০২ সালে। হাওড়ে গোঁসাই ব্যক্তিগত শিক্ষা দীক্ষা পাণ্ডিত্য বংশ গৌরবে বাউল সাধকদের মধ্যে লক্ষণীয় স্বতন্ত্রের অধিকারী তাঁর গানে সংস্কৃত ভাষাজ্ঞান পাণ্ডিত্য এবং শিব শক্তিবাদের গভীর আত্মপোলব্ধির নিদর্শন পাওয়া যায়। তিনি প্রথমে শাক্ত মতবাদের উপাসক ছিলেন, পরে নদীয়া জেলার প্রহ্লাদ চাঁদ গোস্বামীর উপদেশ ও প্রভাবে হাওরে গোঁসাই নাম ধারণ করেন ও বৈষ্ণব সহজ সাধন গ্রহণ করেন। পশ্চিমবঙ্গের বাউলদের মধ্যে তার নাম গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লেখিত হয়। হাওড়ে গোঁসাই দীর্ঘজীবী ছিলেন। তার রচনায় উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের বাংলা কাব্যের সুপরিচিত অনুপ্রাস, শ্লেষ যমক প্রভৃতি লক্ষ্য করা যায়।

স্ব সিন্ধুপারে সে বিন্দুধার, কার সাধ্য যেতে পারে।
আছে মূলেতে মূল, সে ধারার মূল, তত্ত্ব কর আধারে।।
শৃঙ্গার রস যে জেনেছে, তার কি ভয় আছে।
শৃঙ্গার সাধনে শৃঙ্গার রসরাজ মূর্তি দেখেছে।।

যাদুবিন্দু রাঢ়ের বাউল ও বহু সংগীত রচয়িতা। তার বাড়ি বর্ধমান জেলার পাঁচলকি গ্রামে। গুরুর নাম কুবির গোঁসাই। তার নাম যাদব ও তার সহ সাধিকা প্রকৃতির নাম বিন্দু। এই উভয় নাম যোগে রচিত নাম তিনি ভনিতায়

ব্যবহার করেছেন। যাদুবিন্দুর গান বাংলার বাউল মহলে সর্বত্র গীত হয়। বাংলার বিশেষত পশ্চিমবঙ্গের এমন বাউল নেই যার যাদুবিন্দুর দু চারটি গান মুখস্ত না আছে।

ক। আমার এই কাদা মাখা সার হল।
ধর্ম মাছ ধরবো বলে নামলাম জেলে,
ভক্তি জাল ছিঁড়ে গেল।

খ। এমন চাষা বুদ্ধি নাশা তুই,
কেন দেখলি না আপনার ভুঁই।
তোর দেহ জমির পাকা ধানে
দেখ লেগেছে ছটা বাবুই।।

গ। বিষম নদী পাতাল ভেদি ত্রিবেণী।
তায়ে নামলে পরে,
উঠতে নারে,
প্রাণে মরে তখনই।।

পদ্মলোচন বা পোদো একজন প্রাচীন বাউল সংগীত রচয়িতা। তার কোথায় বাড়ি কোথায় আখড়া ছিল তা কেউই সঠিকভাবে বলতে পারেন না। সকলেই বলেন তিনি প্রাচীন পদকর্তা ও রাঢ় দেশের লোক ছিলেন। তার বেশ কয়েকটি গান বর্ধমান থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রাচীন হলেও তার যে গানগুলি পাওয়া গেছে তার ভাষা সম্পর্কে কোন প্রাচীনত্বের অনুমান করা যায় না। খুব বেশি হলে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিক থেকে আরম্ভ করে ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যকাল পর্যন্ত এই পদগুলির রচনাকাল। পদ্মলোচন এর ভাষার ওপর বিশেষ দখল এবং প্রকাশভঙ্গিতেও মুন্সিয়ানা দেখা যায়।।

ক। মানুষ গোঁসাই বিরাজ করে।
তারে চিনলিনে, মন, সামান্য জ্ঞানেরে।।
ও সে বেদের করন ওলট পালট করে।
নতুন পথের খবর দিয়েছে মোদেরে।।

খ। এবার পরশ ছুঁয়ে সোনা হব সাধ ছিল মনে।
হলো না তা তো হ'লোনা,
কেবল তঁবার মিশাল জন্যে।।

অনন্ত গোঁসাই এর অবস্থান কোন অঞ্চলে ছিল সে সম্পর্কে জানা যায়নি। তবে তার রচনারীতি ও দীর্ঘ সাঙ্গ রূপক ব্যবহার থেকে মনে করা হয় ইনি খুব সম্ভব রাঢ়ের বাউল ছিলেন।

ক। কে গড়েছে এমন ঘর, ধন্য কারিকর,
তার কারিকুরির বলিহারী

সেই কারিকরের কোথায় ঘর,
ধন্য কারিকর।।

খ। মন চলো যাই ভ্রমণে কৃষ্ণ-অনুরাগের বাগানে,
সেথা গেলে প্রাণ জুড়াবে
মন্দ মন্দ আনন্দ সমীরনে।।

গ। ওরে মন, জনম তুমি, কেমন গড়নদার,
কেমন স্বর্ণকার।

বাউল গান বাংলার সর্বত্র ছড়িয়ে থাকলেও মূলত পূর্ব বাংলার কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা, মেহেরপুর, ঝিনাইদহ, পাবনা, ফরিদপুর, যশোর জেলায় বেশি জনপ্রিয়। অবিভক্ত নদীয়ার কুষ্টিয়া মহকুমা ছিল বাউল সম্প্রদায়ের পিঠস্থান। বাউল গীতিকারেরা অবিভক্ত বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করেছেন। বেশ কয়েকজন বাউল গীতিকার বিভিন্ন কারণে জন্মস্থান পরিত্যাগ করেছেন এবং অন্য অঞ্চলে এসে পরবর্তী জীবন অতিবাহিত করেছেন। অঞ্চল ভেদে পূর্ববঙ্গের বাউল গীতিকারদের গানের মধ্যে আঞ্চলিক ভাষার প্রভাব বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। যেমন—লালন ফকিরের সাধনক্ষেত্র ছিল কুষ্টিয়া, ঝিনাইদহ, মেহেরপুর, নদিয়া। তার রচিত বাউল গানে এই সমস্ত অঞ্চলের প্রচলিত বাংলা ভাষার প্রভাব পড়েছে।

রবীন্দ্রনাথ সংগৃহীত লালন শাহ ফকিরের কুড়িটি গান সর্বপ্রথম প্রবাসীর 'হারামণি' শীর্ষক বিভাগে প্রকাশিত হয়। এর আগে লালনের দু-চারটি গান কোন কোন সংগীত সংগ্রহে স্থান লাভ করেছে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথই সর্বপ্রথম অতগুলো গান প্রকাশ করে লালনের প্রতি সকলের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করেন। এই গানগুনি খুব সম্ভব লালনের আখড়ায় রক্ষিত একটি খাতা থেকে নকল করে নেওয়া হয়। পরে রবীন্দ্রনাথ শুদ্ধ আকারে সেগুলি প্রকাশ করেন। এই প্রসঙ্গে উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য বলেছেন—

> "এই গানগুলি উনবিংশ শতাব্দীর রচনা। অনেক স্কুলে তৎসম শব্দের বানান ঠিক করিতে না পারায় অশুদ্ধ উচ্চারণ অনুযায়ী বানান লিখিত হইয়াছে। বাগধারা ও অনেক ক্রিয়াপদ কুষ্টিয়া অঞ্চলের সাধারণের চলিত ভাষার অনুরূপ। অজ্ঞতার জন্য যে শব্দগুলি বিকৃত ভাবে উচ্চারিত বা লিখিত হইয়াছে সেইগুলি সেইরূপই রাখা অর্থহীন। সেই জন্যই বোধ হয় রবীন্দ্রনাথ ওই গানগুলি শুদ্ধ উচ্চারণ অনুযায়ী বানান ঠিক করিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন।"

খাঁচার ভিতর অচিন পাখি কেমনে আসে যায়
ধরতে পারলে মন বেড়ি দিতাম তাহার পায়ে।।

লালনের পরে বাউল গানের ও সাধন মার্গের প্রথম সারির রচয়িতা হলেন ফকির পাঞ্চ শাহ। তার জন্ম ১২৫৮ খ্রিস্টাব্দের শ্রাবণ মাসে যশোহর জেলার শৈলকুপা গ্রামে। পরে তিনি হরিশপুর গ্রামে এসে বসবাস করেন। তার রচিত কয়েকটি পদ হল—

ক। যে জানে ব্রজ গোপীর মহাভাব,
ও সে জেন্তে মরে কৃষ্ণ প্রেমের করিছে আলাপ।

খ। এই মানুষের রঙ্গে রসে বিরাজ করে সাঁই আমার
পাঞ্চ বলে মানব লীলা করেছেন সাঁই চমৎকার
মানুষ ভাজ, মানুষ ধর, মন, যাবি তুই ভবপার।

গ। ত্রিবেণীর তীরে তীরে সুধার জোয়ার আসে,
সুখ সাগরে মানুষ খেলে বেহাল বেসে।।

পদগুলিতে আছে মনুষ্যত্বের কথা। রূপকের ব্যবহার করে বাউল সাধনার নিগূঢ় তত্ত্বের রূপচিত্র এঁকেছেন তিনি।

গগন হরকরা নামে পরিচিত বাউল গীতিকার পূর্ব নাম গগনচন্দ্র দাস। ইনি কসবা গোরুরখালি, কুমারখালী শিলাইদহ অঞ্চলে অবস্থান করেছেন। তিনি চিঠি বিলির কাজ করতেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গগন হরকরার দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। তার রচিত বিখ্যাত পদ—

ক। আমি কোথায় পাব তারে
আমার মনের মানুষ যেরে।

খ। তারে ধরি ধরি মনে করি
ধরতে গেলাম আর পেলাম না
দেখেছি রূপ সাগরে মনের মানুষ কাঁচা সোনা।।

হাসান রাজা চৌধুরী সিলেট জেলার সুনামগঞ্জে তেঘরিয়া অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করেন। (১৮৫৪-১৯২২) তিনি ওই স্থানে তার পরবর্তী জীবন অতিবাহিত করেছিলেন। তার রচিত পদ—

আমি ছাড়বো না ঠাকুর চান্দকে
মইলে পে প্রাণ সহ
আমি তোমার কাঙ্গালিনী গো সুন্দরী রাধা।
একদিন তো হবেই মরণ হাসান রাজা।।

কাঙাল হরিনাথ যিনি ফিকির চাঁদ নামে খ্যাত, কুষ্টিয়া জেলার কুমারখালী গ্রামে অর্থাৎ লালন শাহ এর সাথে একই স্থানে বর্তমান ছিলেন। (১৮৩৩-১৮৯৬) তিনি একজন সাংবাদিক ছিলেন। পরে লালনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। তিনিও বেশ কিছু বাউল গান রচনা করেছিলেন—

হরি দিন তো গেল সন্ধ্যা হল
পার করে আমারো।

এই গানটি সত্যজিৎ রায় তার পথের পাঁচালী সিনেমায় ব্যবহার করেছেন।

অষ্টাদশ শতকের একজন বাউল সাধক ও দার্শনিক ছিলেন সিরাজ সাঁই (১৭১৮১৭৯৮। তিনি বেশ কিছু বাউল গান রচনা করেন। সৈয়দ জাহিদ হাসান তার 'লালন গুরু সিরাজ সাইয়ের গান' গ্রন্থে সিরাজ শাহের শতাধিক গান সংগ্রহ করে লিপিবদ্ধ করেন। তিনি লালন ফকিরের দীক্ষাগুরু ছিলেন। বাংলাদেশের ঝিনাইদহ জেলার হরিশপুর গ্রামে সিরাজ সাঁইয়ের সমাধি অবস্থিত।

সপ্তদশ শতক থেকে শুরু করে বাউল গানের যে অগ্রগতি এবং বিভিন্ন অঞ্চলের বাউল সাধক তথা গীতিকারদের

বচিত বাউল গানের ভাষায় যে বৈচিত্র পরিলক্ষিত হয় তা বাউল গান গুলি লক্ষ্য করলেই চোখে পড়ে। এই গানের ভাবের গভীরতা, সুরের মাধুর্য বাণীর সার্বজনীন মানবিক আবেদন বিশ্ববাসীকে মহামিলনের মন্ত্রে আহ্বান করে।

সহায়ক গ্রন্থ

১. ক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী, বাংলার বাউল, নবযুগ প্রকাশনী।
২. মালাধর বসু, শ্রীকৃষ্ণ বিজয়, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সংস্করণ।
৩. কৃষ্ণদাস কবিরাজ, শ্রীশ্রী চৈতন্য চরিতামৃত, মধ্যলীলা, একুশ পরিচ্ছেদ।
৪. মনীন্দ্রমোহন বসু সম্পাদিত রাগাত্মিকা পদ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।
৫. চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গবীণা কবিতা সংগ্রহ পুস্তক, ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস।
৬. জসীমউদ্দীন, মুর্শীদাগান, পলাশ প্রকাশনী, দ্বিতীয় সংস্করণ ২০০৩।
৭. মোহাম্মদ আব্দুল করিম মিন, বাউল লালন পরিভাষা, নবযুগ প্রকাশনী।
৮. উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, বাংলার বাউল ও বাউল গান, ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি।
৯. সুধীর চক্রবর্তী, বাউল-ফকির কথা, আনন্দ পাবলিশার্স।
১০. শ্রী মতিলাল দাস ও শ্রী পীযূষকান্তি মহাপাত্র সম্পাদিত লালন গীতিকা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।
১১. মো আব্দুল করিম মিঞা, বাংলার বাউল-ফকির সাধনা ও দর্শন, নবযুগ প্রকাশনী।

কৃষ্ণা মাখাল
রিসার্চ স্কলার, রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়,
পশ্চিমবঙ্গ

রবীন্দ্র-সমালোচক সুখময় মুখোপাধ্যায়

শিউলি বসাক

প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যচর্চায় অবিসংবাদিত অবদানের পাশাপাশি অধ্যাপক সুখময় মুখোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যের বিচিত্র পরিসরে স্বচ্ছন্দ বিচরণ করেছেন। বিপুল বৈচিত্রময় রবীন্দ্র-সাহিত্যসহ আধুনিক বাংলা সাহিত্যের নানাবিধ দিক তাঁর আলোচনার বিষয় হিসেবে উঠে এসেছে বারংবার। 'রাজা গণেশের আমল' (১৯৫৫), 'প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের কালক্রম' (১৯৫৮), 'কৃত্তিবাস-পরিচয়' (১৯৫৯), 'বাংলার ইতিহাসের দু'শো বছর: স্বাধীন সুলতানদের আমল' (১৯৬২), 'বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন কবিদের পরিচয় ও সময়' (১৯৭৩), 'মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের তথ্য ও কালক্রম' (১৯৭৪), চৈতন্যদেব জীবনী : কালক্রম : পরিমণ্ডল : প্রিয়মণ্ডল' (১৯৮৪), 'বাংলায় মুসলিম অধিকারের আদিপর্ব' (১৯৮৮), 'বাংলার নাথ-সাহিত্য' (১৯৯৪)-এর মতো গ্রন্থের পাশাপাশি 'রবীন্দ্র-সাহিত্যের নবরাগ' (১৯৬১), 'আধুনিক বাংলা সাহিত্যের দ্বিপ্রহর' (১৯৬৪)-এর মতো গ্রন্থও তিনি রচনা করেছেন। তবে প্রাচীন-মধ্যযুগ বিশেষজ্ঞ হিসেবে তাঁর পরিচয়ের পাশে অনেকটাই অনালোচিত রবীন্দ্র-সমালোচক হিসেবে তাঁর পরিচয়। তাই তাঁর 'রবীন্দ্র-সাহিত্যের নব রাগ' গ্রন্থটির প্রতি দৃষ্টি-আকর্ষণ করে তাঁর রবীন্দ্রচর্চার স্বরূপও প্রবণতাকে তুলে ধরাই বর্তমান নিবন্ধের অন্বিষ্ট।

১৯৬১ অর্থাৎ রবীন্দ্র-জন্ম শতবার্ষিকীতে যখন রবীন্দ্র-বিষয়ক অজস্র গ্রন্থ প্রকাশিত হচ্ছে, তখনই ভারতী বুক স্টল থেকে প্রকাশিত হয়েছিল সুখময় মুখোপাধ্যায়ের 'রবীন্দ্র-সাহিত্যের নব রাগ' গ্রন্থটি। প্রমথনাথবিশী এই গ্রন্থের 'পরিচয়' শীর্ষক ভূমিকায় বলেছেন—

> "রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে নিত্যনূতন বই প্রকাশিত হচ্ছে, বিশেষত এবছরটায়। সে-সব গ্রন্থের অধিকাংশই ছাত্রবন্ধু, অর্থাৎ পরীক্ষা-বৈতরণী পার করাবার খেয়া-নৌকামাত্র। আর একশ্রেণীর বই লিখিত হচ্ছে যার উদ্দেশ্য বুঝে ওঠা সহজ নয়; না আছে তাতে চিন্তা বা অধ্যয়নের পরিচয় বা না আছে বিশেষ কিছু বক্তব্যের চিহ্ন। সুখময়বাবুর বইএ দুইশ্রেণীর কোনটার অন্তর্গত নয়। চিন্তার ধীরতা আর অধ্যয়নের গভীরতা দুই-ই আছে বইখানায় - আর সেইজন্যই লেখকের বক্তব্যও প্রকট হতে পেরেছে।"[১]

এই গ্রন্থে সুখময় মুখোপাধ্যায় রবীন্দ্র-সাহিত্যের এমন কিছু বিশেষ দিক নিয়ে আলোচনা করেছেন, যে দিকগুলি আগে অনালোচিত ছিল; বা আলোচিত হলেও আরও অনেক নতুন দৃষ্টিকোণ সংযোজন করেছেন তিনি। ফলত, রবীন্দ্র-সাহিত্য সমালোচনার ধারায় একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন এই গ্রন্থ।

'বিসর্জন', 'শারদোৎসব', 'রোগশয্যায়-আরোগ্য-জন্মদিনে', 'কালান্তর', 'জাভা-যাত্রীর পত্র', 'প্রাচীন সাহিত্যের কালিদাস এবং রবীন্দ্র-সাহিত্যে তাঁর প্রভাব', 'রবীন্দ্রনাথ ও এডগার অ্যালান পো', 'লিপিকা', ও 'পঞ্চভূত' বিভিন্নসময়ে লেখা এই নয়টি রবীন্দ্র-বিষয়ক প্রবন্ধের সংকলনই হল 'রবীন্দ্র-সাহিত্যের নব রাগ' গ্রন্থটি। অর্থাৎ শিরোনামের 'নব' শব্দটি 'নয়' অর্থে প্রযুক্ত। তবে 'নব' শব্দটিকে 'নতুন' অর্থে গ্রহণ করলেও যে গ্রন্থনামের তাৎপর্য খুঁজে পাওয়া যাবে, সেপ্রসঙ্গে স্বয়ং লেখক 'গ্রন্থকারের নিবেদন'-এ বলেছেন—

বসাক, শিউলি : রবীন্দ্র-সমালোচক সুখময় মুখোপাধ্যায়
Open Eyes : Indian Journal of Social Science, Literature, Commerce & Allied Areas, Volume 22, No. 1, June 2025, Pages : 26-34, ISSN : 2249-4332

> "কোন একটি বিশেষ সাহিত্যকে বিভিন্ন সমালোচকেরা বিভিন্ন দৃষ্টি দিয়ে দেখেন এবং তাঁদের সমালোচনার ভাষা ও ভঙ্গী বিভিন্ন রকমের হয়। ফলে প্রতি সমালোচনার মধ্য দিয়েই ঐ সাহিত্যে এমন একটি রং লাগে, যা ইতিপূর্বে তার মধ্যে দেখা যায়নি। রবীন্দ্র-সাহিত্যের সমালোচনা সম্বন্ধেও এই কথা প্রযোজ্য। আমার সমালোচনাও তার ব্যতিক্রম নয়, এর নিজস্ব মূল্য যা-ই হোক না কেন।"[২]

এই প্রবন্ধ গ্রন্থের প্রথম প্রবন্ধটি 'বিসর্জন' নাটক বিষয়ক, প্রবন্ধের শিরোনামও 'বিসর্জন'। লক্ষণীয়, তাঁর প্রতিটি প্রবন্ধের শিরোনাম বাহুল্যবর্জিত। বিন্দুমাত্র আড়ম্বরের মধ্যে না গিয়ে প্রাবন্ধিক খুব সহজ-সরলভাবে প্রবন্ধের বিষয়টিকে তুলে ধরেছেন শিরোনামে।'বিসর্জনে'র মূলে 'রাজর্ষি', আর 'রাজর্ষি' উপন্যাসটির মূলে একটি স্বপ্ন এই প্রাক-ইতিহাস দিয়ে শুরু করেছেন প্রাবন্ধিক। তবে 'বিসর্জন' নাটকটিকে নিছকই 'রাজর্ষি' উপন্যাসের নাট্য-রূপান্তর বলে মানতে নারাজ তিনি। 'বিসর্জন' যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি নতুন সৃষ্টি, তার স্বপক্ষে তিনি একের পর এক অনেকগুলি যুক্তি দিয়েছেন। যুক্তিগুলো মূলত 'রাজর্ষি' এবং 'বিসর্জনে'র বিপুল ফারাককে তুলে ধরেছে—

> "রাজর্ষিতে যে সমস্যার অবতারণা করা হয়েছে, তা একটি বিশেষ যুগের একটি বিশেষ দেশ ও এক বিশেষ রাজার সমস্যা, কিন্তু বিসর্জননাটকের বিষয়ীভূত সমস্যা কোন বিশেষ যুগ, দেশ বা পাত্রের মধ্যে আবদ্ধ নয়, তা মানব সাধারণের চিরন্তন সমস্যা।"[৩]

এভাবেই প্রাবন্ধিক দেখিয়েছেন যে, 'রাজর্ষি' উপন্যাস এবং 'বিসর্জন' নাটকটির গোত্র সম্পূর্ণ আলাদা। এরপর প্রাবন্ধিকট্র্যাজেডির স্বরূপ নির্ণয় করে, বিসর্জন নাটকেরট্র্যাজিক উপাদানগুলিতে আলোকপাত করেছেন। নাটকের সংঘাত, চরিত্রায়ন সম্পর্কে আলোচনার পাশাপাশি এই নাটকে লিরিক উপাদান মাত্রা ছাড়িয়েগিয়েছে কিনা তা বিচার করেছেন। যদিও এই নাটকটি সম্পর্কে সমালোচক মহলে কথা উঠেছিল, "ড্রামাটিক বলা নাহি যায় ঠিক,/ লিরিকের বড়ো বাড়াবাড়ি।"[৪] কিন্তু সুখময় মুখোপাধ্যায়ের মতে এই নাটকে লিরিক উপাদান যেটুকু আছে তা নাটকীয় সংঘাতের মাঝে একান্ত প্রয়োজনীয় 'ড্রামাটিক রিলিফ' হিসেবেই কাজ করেছে,

> "বিসর্জনে লিরিক-উপাদানের তুলনায় সংঘাতের পরিমাণ অনেক বেশী। সংঘাত-পরম্পরার মধ্য দিয়ে এর নাট্যরস জমে উঠেছে। সে সংঘাতখুবই তীব্র ধরণের। নাটকের লিরিক-উপাদানগুলি বরং সংঘাতের তীব্রতাকে স্থানে স্থানে প্রশমিত করে একান্ত প্রয়োজনীয় dramatic relief দিয়েছে।"[৫]

এরপরে এই নাটকের বেশ কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতিও তুলে ধরেছেন তিনি। নাটকের শেষদৃশ্যের শেষাংশটি নিয়ে তিনি আপত্তি জানিয়েছেন। এই শেষাংশটি নাটকের উৎকর্ষকে খানিকটা খর্ব করেছে বলে মনে করেছেন তিনি। নাটকের শেষাংশটি উদ্ধৃত করে তিনি দেখিয়েছেন যে, নাটকের শেষে "রঘুপতি পেলেন অপর্ণাকে, রাজা পেলেন রাণীকে, রাণী পেলেন রাজাকে। এর ফলে ট্র্যাজেডির তীব্র বেদনা খানিকটা লঘু হয়ে গিয়েছে। বিসর্জনের এই একটি প্রধান ত্রুটি। ... কার্যকারণ পরম্পরার মধ্য দিয়ে আসেনি বলে এটিকে নাটকের প্রক্ষিপ্ত অংশ বলে মনে হয়।"[৬] এছাড়া তিনি দেখিয়েছেন, এই নাটকের পঞ্চম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে কিছু পরিমাণে মেলোড্রামার উপাদান প্রবেশ করেছে—

> "প্রচণ্ড ঝড়বৃষ্টির মধ্যে জয়সিংহের উন্মত্তভাবে মন্দিরে প্রবেশ, দীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান, তারপর বুকে ছুরি বিঁধিয়ে প্রাণ বিসর্জন দেওয়া—এ সমস্ত ব্যাপার অত্যন্ত আকস্মিক ও চমকপ্রদ ধরণের, এর জন্যে আমাদের মনকে প্রস্তুত করে তোলা হয়নি। জয়সিংহের এই আকস্মিক আত্মহত্যার ঠিক পরেই অপর্ণার মন্দিরে প্রবেশ ও মূর্ছিত হয়ে পড়া এবং রঘুপতির 'ফিরে দে, ফিরে দে, ফিরে দে' বলে চিৎকার—এর মধ্যেও রয়েছে সেই অতি নাটকীয় ভাব। এই দৃশ্যটি কিঞ্চিৎ পরিমাণে মেলোড্রামাধর্মী

হয়ে পড়ায় বিসর্জনের সূক্ষ্মতা সামান্য হ্রাস পেয়েছে।"[৭]

এই চুলচেরা বিশ্লেষণে প্রাবন্ধিকের অধ্যাবসায়, বিশ্লেষণী দক্ষতা এবং যুক্তিসিদ্ধ সিদ্ধান্তের প্রতি আনুগত্য স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এরপরেও প্রাবন্ধিক নাটকটির নামকরণের সার্থকতা বিচার করেছেন। সবশেষে 'বিসর্জন' নাটকের নায়ক কে—সেই প্রশ্নের উত্তর অন্বেষণ। রাজা গোবিন্দমাণিক্য, রঘুপতি ও জয়সিংহ—তিনজনের মধ্যে নায়কোচিত বিভিন্ন গুণ যেমন রয়েছে, তেমনি অন্যদিকে বিশেষ একজনের মধ্যে নায়কের সমস্ত গুণ একসঙ্গে পাওয়া যায় না। একে 'আধুনিকতার লক্ষণ' বলে উল্লেখ করে প্রাবন্ধিক যেভাবে ব্যাখ্যা করেছেন তাতে তাঁর মনস্বিতার পরিচয় পাওয়া যায়—

> "আধুনিক যুগে পৃথিবীতে রাজতন্ত্র প্রায় বিলুপ্ত, তার জায়গায় গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয়েছে, তাতে সমস্ত মানুষের সমান অধিকার স্বীকৃত হয়েছে। সেই রকম, প্রাচীন যুগের প্রত্যেক নাটকে যেমন একজন নায়ক থাকা অপরিহার্য ছিল, আধুনিক যুগের নাটকে তা আবশ্যক বলে বিবেচিত হয় না।"[৮]

সবশেষে বিসর্জন নাটকটির প্রচলিত সংস্করণের পরিশিষ্ট অংশটি (শান্তিনিকেতনে 'বিসর্জন'-অধ্যাপনাকালে রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক কথিত) নিয়ে আলোচনা করেছেন। উল্লেখ্য, আলোচ্য গ্রন্থের 'গ্রন্থকারের নিবেদন' অংশেই প্রাবন্ধিক জানিয়েছিলেন যে, 'বিসর্জন' প্রবন্ধটিতে তিনি 'বিসর্জনে'র রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশায় প্রকাশিত সর্বশেষ সংস্করণের পুনর্মুদ্রণ ব্যবহার করেছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বিসর্জনের প্রথম সংস্করণের (১২৯৭ বঙ্গাব্দ) সঙ্গে উক্ত সংস্করণের পার্থক্যগুলিকেও তুলে ধরেছিলেন সেখানে।

'শারদোৎসব' শীর্ষক দ্বিতীয় প্রবন্ধটির শুরুতেই প্রাবন্ধিক তুলে ধরেছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রকৃতি-ভাবনার মূল কথাটিকে—

> "তাঁর কাছে প্রকৃতি জড় পদার্থ নয়, একটি প্রাণবন্ত সত্তা; মানুষের অন্তরের সঙ্গে তার অচ্ছেদ্য আত্মীয়তার সম্পর্ক।"[৯]

'শারদোৎসব' নাটকে শরৎ ঋতুর মূল তত্ত্বটিকে এভাবে তুলে ধরেছেন প্রাবন্ধিক, "সৌন্দর্যের মধ্য দিয়ে জগৎ বিধাতার কাছে তার আনন্দের ঋণ শোধ করছে।"[১০]

'শারদোৎসব' নাটকে সন্ন্যাসীর কণ্ঠে আমরা শুনেছিলাম—

> "আজ স্পষ্ট প্রত্যক্ষ দেখতে পাচ্ছি—জগৎ আনন্দের ঋণ শোধ করছে। বড়ো সহজে করছে না, নিজের সমস্ত শক্তি দিয়ে সমস্ত ত্যাগ করে করছে। সেইজন্যেই ধানের খেত এমন সবুজ ঐশ্বর্যে ভরে উঠেছে, বেতসিনীর নির্মলজল এমন কানায় কানায় পরিপূর্ণ! কোথাও সাধনার এতটুকু বিশ্রাম নেই, সেইজন্যেই এত সৌন্দর্য।"[১১]

ঋণ শোধের তত্ত্বটি উপনন্দের কাহিনির মধ্য দিয়ে কীভাবে আরও পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে, সে বিষয়েও আলোকপাত করেছেন প্রাবন্ধিক। নাটকটির ভাব ও ভাষা শরৎ ঋতুর বিশিষ্ট রূপটিকে ফুটিয়ে তুলতে কতটা সহায়ক হয়ে উঠেছে, সে বিষয়ে প্রাবন্ধিকের মত—

> "এই নাটকের সংলাপের মধ্যে কোথাও কোন গাম্ভীর্য নেই। সর্বত্রই একটা লঘু ও স্বচ্ছন্দ ভাব। এ যেন শরতের হাল্কা রূপটিরই সার্থক প্রতিচ্ছবি।"[১২]

এরপর নাটকটির চরিত্র-চিত্রণ, গানের বিশিষ্ট ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করে, সবশেষে এই নাটকটি শান্তিনিকেতনবাসীদের জীবনে যে বিপুল প্রভাব বিস্তার করেছে সেদিকে ইঙ্গিত করেছেন।

তৃতীয় প্রবন্ধটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের তিনটি কাব্যগ্রন্থ নিয়ে, নাম 'রোগশয্যায়-আরোগ্য-জন্মদিনে'। এই তিনটি কাব্যগ্রন্থের মধ্যে ভাব, সুর ও প্রকাশের ক্ষেত্রে মিল থাকায় একসঙ্গে আলোচনা করেছেন প্রাবন্ধিক—

> "এ কাব্যগুলি পরিণত বার্ধক্যের, মৃত্যুধৃত জীবনের শুভ্র জ্যোতিতে উদ্ভাসিত। জীবন ও মৃত্যু, ধ্বংস ও সৃষ্টির একটি গভীর দর্শন, নিবিড় প্রত্যয় এই তিনটি কাব্যগ্রন্থের মধ্যে আপনাকে প্রকাশ করেছে।"[১৩]

এই কাব্যগ্রন্থ গুলির পূর্ববর্তী কাব্যধারার সঙ্গেও যে যোগ রয়েছে, সে বিষয়েও ইঙ্গিত করেছেন প্রাবন্ধিক—

> "পূরবীতে কবির কাব্যে যে আসন্ন বিদায়ের ম্লান গোধূলিচ্ছটা সংক্রামিত হয়েছে, তারই গাঢ় থেকে গাঢ়তর রাগে পরবর্তী কাব্যগুলি রঞ্জিত। প্রান্তিক-এ মৃত্যুর সঙ্গে ক্ষণিক সম্মুখ-সাক্ষাতের অভিজ্ঞতার প্রভাবে কবির মৃত্যু সম্বন্ধে মনোভাব একটি নতুনতর রূপ লাভ করেছে, কল্পনার বর্ণালী এবং সুরের লঘুতা থেকে মুক্ত হয়ে কবির মৃত্যুদর্শন স্থির নিঃসংশয় উপলব্ধি এবং স্বচ্ছ সাবলীল প্রকাশভঙ্গীর মধ্য দিয়ে সুস্পষ্ট, জড়িমাহীন অভিব্যক্তি লাভ করেছে।"[১৪]

এরপর কাব্যগ্রন্থগুলির ভাষা, ছন্দ নিয়েও আলোকপাত করেছেন প্রাবন্ধিক। কাব্যগ্রন্থ তিনটির মধ্যে কিছু বহিরঙ্গ প্রভেদ থাকলেও, মূল সুরটি যে এক—এই প্রবন্ধটিতে তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

চতুর্থ প্রবন্ধটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'কালান্তর' প্রবন্ধ গ্রন্থটিকে নিয়ে। ভারতের রাষ্ট্রনৈতিক ইতিহাসের এক বিশেষ লগ্ন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মনে যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল, তা 'কালান্তর' গ্রন্থের প্রবন্ধগুলির মধ্যে কীভাবে ধরা পড়েছে তা-ই তুলে ধরেছেন প্রাবন্ধিক। এই প্রবন্ধগুলির প্রকাশভঙ্গি সম্পর্কে তিনি যথার্থই বলেছেন—

> "রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য প্রবন্ধের মধ্যে যে মৃদু, পুষ্পিত, কাব্যময় ভাষা দেখা যায়, এই প্রবন্ধগুলির মধ্যে তার খুব অল্প নিদর্শনই মেলে। এদের ভাষা গম্ভীর, স্পষ্ট, তীক্ষ্ণ, প্রত্যক্ষ। সোজাসুজি তা আমাদের মনে আঘাত করে। শুধু তাই নয়, সে আঘাত নির্মম। আমাদের রাষ্ট্রনৈতিক ও সামাজিক জীবনের প্রতিটি গ্লানি তিনি যে ভাষায় ও যে ভঙ্গীতে উদ্ঘাটন করেছেন, তার মধ্যে কোন সঙ্কোচ বা চক্ষুলজ্জা নেই। তাকে অস্বীকার করবারও কোন উপায় নেই। 'কালান্তরে' রবীন্দ্রনাথের বাণী ন্যায়দণ্ডের বিধানের মতই অমোঘ ও নিষ্ঠুর।"[১৫]

এভাবে এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের অপরাপর প্রবন্ধ সাহিত্যের থেকে 'কালান্তর' প্রবন্ধ গ্রন্থের স্বাতন্ত্র্য স্পষ্টভাবে চিহ্নিত হয়েছে। এছাড়া 'প্রভুসম্মিত', 'সুহৃৎসম্মিত' ও 'কান্তাসম্মিত' এই তিন রকম সাহিত্যের বাণীর কথা উল্লেখ করে, প্রাবন্ধিক 'কালান্তর' গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের 'প্রভুসম্মিত' কণ্ঠস্বরকে চিহ্নিত করেছেন। এরপরে 'কালান্তরে'র প্রবন্ধগুলির মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের যে বক্তব্য প্রকাশিত হয়েছে, সেগুলি সংক্ষেপে তুলে ধরেছেন এই প্রবন্ধে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কীভাবে রাষ্ট্রনৈতিক সংকটকে চিহ্নিত করেছেন এবং তার সমাধানের যে উপায় দেখিয়েছেন, তাও তুলে ধরেছেন প্রাবন্ধিক। অসামান্য শিল্প-নৈপুণ্যের পাশাপাশি লেখকের ত্রুটি-বিচ্যুতি গুলিকেও প্রাবন্ধিক নির্দ্বিধায় লিপিবদ্ধ করেছেন—

> "গ্রন্থ হিসাবে 'কালান্তর' একেবারে ত্রুটিহীন নয়। এর প্রধান দোষ, অধিকাংশ প্রবন্ধে একই কথা বিভিন্ন ভাবে ও ভঙ্গিমায় উপস্থাপিত হয়েছে। কতকগুলির যুক্তি খুব প্রাঞ্জল নয়, কতকগুলির পিছনে উপযুক্ত তথ্যের সমর্থন নেই।"[১৬]

তবে এই সব ত্রুটি-বিচ্যুতি কালান্তর গ্রন্থের গুরুত্বকে বিন্দুমাত্র খর্ব করতে পারেনি, সেকথাও স্বীকার করেছেন প্রাবন্ধিক।

পঞ্চম প্রবন্ধটি 'জাভা-যাত্রীর পত্র' নিয়ে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর সমগ্র জীবনে বিশ্বের নানা প্রান্তে ভ্রমণ করেছেন। সেই সূত্রেই আমরা পেয়েছি 'য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র', 'য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি', 'জাপান-যাত্রী', 'পশ্চিম-যাত্রীর ডায়ারি', 'রাশিয়ার চিঠি', 'পারস্যে' ইত্যাদি। তবে এই ভ্রমণ-বিবরণগুলির মধ্যে'জাভা-যাত্রীর পত্রে'র স্বাতন্ত্র্যটিকে খুব স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করেছেন প্রাবন্ধিক—

> "এর আগে তিনি কখনও ঐ দেশে যান নাই। এইজন্য সেখানকার সব কিছুর মধ্যেই তিনি নতুনত্বের স্বাদ পাবেন—এটাই পরম স্বাভাবিক। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, তিনি এমনভাবে জাভাকে দেখেছেন যেন তার সঙ্গে তাঁর বহুদিনের পরিচয়; সে দেশের জীবন-যাত্রা, আচার-অনুষ্ঠান, ধর্ম-কর্ম কিছুই তাঁর অপরিচিত নয়। অত্যন্ত অভ্যস্ত অনায়াস ভঙ্গীতে তিনি ঐ দ্বীপকে ও দ্বীপবাসীদের দর্শন করেছেন এবং উত্তরোত্তর তাঁর মনে অজ্ঞাতকে জানার অভিনব উপলব্ধির পরিবর্তে এমন একটি অপরূপ চেতনার সঞ্চার হয়েছে, নিকট স্বজনের সঙ্গে দীর্ঘ বিচ্ছেদের পর পুনর্মিলনের আনন্দের সঙ্গেই যার তুলনা চলে।"[১৭]

এপ্রসঙ্গে প্রাবন্ধিক স্মরণ করেছেন ভারতবর্ষের গৌরবময় অতীতকে, যখন ভারতবর্ষ জাভাতে উপনিবেশ স্থাপন করেছিল। জাভার শিল্পকলায় রামায়ণ-মহাভারতের প্রভাব, স্থাপত্য-ভাস্কর্যে প্রাচীন ভারতের দান সে বিষয়েও আলোকপাত করেছেন প্রাবন্ধিক। 'জাভা-যাত্রীর পত্র'-এর ১৪নং পত্রে আমরা দেখি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলছেন—

> "রামায়ণের মহাভারতের গল্প এ দেশের লোকের মনকে জীবনকে যে কিরকম গভীরভাবে অধিকার করেছে তা এই কদিনেই স্পষ্ট বোঝা গেল।"[১৮]

ষষ্ঠ প্রবন্ধটির বিষয় 'প্রাচীন সাহিত্যের কালিদাস এবং রবীন্দ্র-সাহিত্যে তাঁর প্রভাব'। এই প্রবন্ধে প্রাবন্ধিক সুখময় মুখোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'প্রাচীন সাহিত্য' গ্রন্থটির সাহিত্যিক মূল্য সম্পর্কে আলোচনা করে, গ্রন্থটিকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'শ্রেষ্ঠ গদ্যগ্রন্থগুলির অন্যতম, কোন কোন দিক দিয়ে সর্বশ্রেষ্ঠ' বলে উল্লেখ করেছেন। 'প্রাচীন সাহিত্য' গ্রন্থের 'মেঘদূত', 'কুমারসম্ভব ও শকুন্তলা', 'শকুন্তলা', 'কাব্যে উপেক্ষিতা' প্রবন্ধগুলি এই গ্রন্থের অন্যান্য প্রবন্ধগুলির তুলনায় যে সার্থকতর, তার দুটি কারণ নির্দেশ করেছেন প্রাবন্ধিক। প্রথম কারণ হিসেবে তিনি বলেছেন, এই প্রবন্ধগুলি রবীন্দ্রনাথের স্বাধীন স্বতঃস্ফূর্ত সৃষ্টি; 'রামায়ণ', 'কাদম্বরীচিত্র' ইত্যাদি প্রবন্ধগুলির মতো অনুরোধে লেখা নয়। দ্বিতীয় কারণ হিসেবে তিনি নির্দেশ করেছেন যে, প্রাচীন কবিদের মধ্যে কালিদাসই রবীন্দ্রনাথের উপরে সবচেয়ে বেশি প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। 'মেঘদূত' নিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অনেক কবিতা, গান, প্রবন্ধ রচনা করলেও সেগুলির মধ্যে 'প্রাচীন সাহিত্য' গ্রন্থের প্রবন্ধটিকে অতুলনীয় বলে উল্লেখ করেছেন প্রাবন্ধিক। তবে 'শকুন্তলা' প্রবন্ধটির নামকরণ সম্পর্কে তাঁর আপত্তি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। প্রবন্ধটির নাম 'টেম্পেস্ট ও শকুন্তলা' হলে যথাযথ হতো বলে মনে করেছেন প্রাবন্ধিক। কারণ, 'কুমারসম্ভব ও শকুন্তলা' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ যেমন কুমারসম্ভব ও শকুন্তলার মধ্যে তুলনা করেছেন, তেমনই অন্যদিকে 'শকুন্তলা' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ শকুন্তলার সঙ্গে শেক্সপিয়ারের 'টেম্পেস্ট' নাটকের তুলনা করেছেন। তবে আমাদেরকে মনে রাখতে হবে যে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কুমারসম্ভব ও শকুন্তলার মিল দেখিয়েছিলেন, কিন্তু 'শকুন্তলা' নাটকে টেম্পেস্ট এবং শকুন্তলার মধ্যে তিনি মূলত অমিল দেখিয়েছিলেন। কালিদাসের শকুন্তলার ছায়াপাত প্রাবন্ধিক 'চোখের বালি' ও 'ঘরে বাইরে'তেও খুঁজে পেয়েছেন—

> "কালিদাসের দুষ্যন্ত ও শকুন্তলার মতো রবীন্দ্রসাহিত্যের নরনারীরাও দুঃখের তপস্যার মধ্য দিয়ে অসংযমের ক্ষালন করে অবশেষে শান্তি ও শুচিতার স্নিগ্ধ স্পর্শ লাভ করেছে। 'চোখের বালি'র

> মহেন্দ্র ও বিনোদিনী দুরন্ত অতৃপ্ত তৃষ্ণা নিয়ে শুধু মৃগতৃষ্ণিকায় বিভ্রান্ত হয়েছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁরা অনুতাপ ও আত্মগ্লানির বিষম পীড়নে জর্জরিত হয়ে মর্মদাহ ভোগ করলেন এবং তার অবসানে তাঁরা সুখের সন্ধান না পেলেও শান্তির আশ্বাস লাভ করলেন। 'ঘরে বাইরে'র বিমলার কাহিনীও এই প্রলোভন, বঞ্চনা, আত্মগ্লানি ও সান্ত্বনা লাভের মর্মস্পর্শী ইতিহাস।"[১৯]

গভীর অনুসন্ধিৎসু গবেষকের চোখেই এই ছায়াপাত আবিষ্কার করা সম্ভব।

আলোচ্য গ্রন্থের সপ্তম প্রবন্ধটি হল 'রবীন্দ্রনাথ ও এডগার অ্যালান পো'। এই প্রবন্ধটি সম্পর্কে প্রমথনাথ বিশীর মতামত বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য—

> "প্রবন্ধটি বোধকরি এই গ্রন্থের শ্রেষ্ঠ সম্পদ, কেন না এই দুইজন সাহিত্যিকের মধ্যে মিল থাকা সত্ত্বেও এ পর্যন্ত বিষয়টি আলোচিত হয়নি। লেখক এ দিকে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে বাঙালীর কৃতজ্ঞতা ভাজন হলেন।"[২০]

এই প্রবন্ধে সুখময় মুখোপাধ্যায় রবীন্দ্রকাব্যে পো-এর কবিতার প্রভাবগুলিকে উদাহরণসহ তুলে ধরেছেন। রবীন্দ্রনাথের গদ্যকবিতার পেছনেও পো-এর 'Prose Poem'-এর প্রভাব আছে বলে মনে করেছেন তিনি। এরপরে তিনি এসেছেন ছোটগল্পের আলোচনায়। গল্পকার হিসেবে এডগার অ্যালান পো এবং রবীন্দ্রনাথের তুলনামূলক আলোচনায় তিনি একটি বিশেষ ক্ষেত্রে উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্য লক্ষ করেছেন, দুজনেই অতিপ্রাকৃত বিষয় নিয়ে কয়েকটি গল্প লিখেছেন এবং সেই গল্পগুলি উভয়েরই গল্পভাণ্ডারে সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করে আছে। কিছু গল্পের উদাহরণ তুলে ধরে প্রাবন্ধিক রবীন্দ্রগল্পে পো-এর গল্পের প্রভাব দেখিয়েছেন। 'নিশীথে' গল্পটিতে 'লিজিয়া' গল্পের প্রভাব বিস্তারে আলোচনা করেছেন। প্রাবন্ধিকের অনুমান রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নিশ্চয়ই 'লিজিয়া' গল্পটি পড়েছিলেন। 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসটিতেও 'লিজিয়া'র কিছু প্রভাব লক্ষ করেছেন তিনি। নিছক ঘটনাগত সাদৃশ্য নয়, তিনি যেভাবে মূল টেক্সট থেকে উদ্ধৃত করে ভাষারীতিগত সাদৃশ্যগুলিকেও তুলে ধরেছেন, তাতে তাঁর অধ্যবসায় স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'লিপিকা' গ্রন্থটিতে বিষয়বস্তু, ভাব, ভাষা ও ভঙ্গি এই চারটি অঙ্গ কীভাবে অবিচ্ছেদ্য সূত্রে জড়িয়ে আছে, তা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে অষ্টম প্রবন্ধটিতে। 'লিপিকা'র স্বচ্ছন্দ অনায়াস ভঙ্গি বিস্মিত করেছে প্রাবন্ধিককে—

> "মনে হয় এগুলি এতই সরল! এদের ভাব যে কত জটিল, ভাষা ও ভঙ্গীর এই সরলতা তা আমাদের বুঝতে দেয় না। আবার এই সরল ভাষা ও ভঙ্গীর মধ্যেই রয়েছে দক্ষ হাতের সূক্ষ্ম কারুকার্য, বিচিত্র ও বর্ণাঢ্য শিল্প-সুষমা।"[২১]

'লিপিকা' গ্রন্থটির প্রথম অংশের রচনাগুলিকে 'ভাব-গভীর', দ্বিতীয় অংশের রচনাগুলিকে 'কাহিনী-প্রধান' বলে উল্লেখ করেছেন তিনি। আর ভারতবর্ষীয় জীবনের বিভিন্ন দিকে যে গ্লানি প্রবেশ করেছিল, সেসব তৃতীয় অংশের রচনাগুলিতে গল্পের মধ্য দিয়ে কীভাবে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে, তাও আলোচনা করেছেন প্রাবন্ধিক। এরপরে 'লিপিকা'র রচনাগুলি কতটা গদ্যকবিতার পর্যায়ভুক্ত তা বিচার করতে গিয়ে তিনি তাঁর পাণ্ডিত্য ও মৌলিক ভাবনাচিন্তার পরিচয় রেখেছেন। এপ্রসঙ্গে তিনি গদ্যের সঙ্গে পদ্যের প্রভেদগুলিকে তুলে ধরে, স্পষ্টতই জানিয়েছেন যে, "লিপিকা-র সব রচনাকেই 'গদ্য-কবিতা' আখ্যায় অভিহিত করবার অনুকূলে কোন যুক্তি নেই।"[২২] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'পুনশ্চ' কাব্যগ্রন্থের 'ভূমিকা'য় স্পষ্ট উল্লেখ করেছিলেন—

> "গীতাঞ্জলির গানগুলি ইংরেজি গদ্যে অনুবাদ করেছিলেম। এই অনুবাদ কাব্যশ্রেণীতে গণ্য হয়েছে।

> সেই অবধি আমার মনে এই প্রশ্ন ছিল যে, পদ্যছন্দের সুস্পষ্ট ঝংকার না রেখে ইংরেজিরই মতো বাংলা গদ্যে কবিতার রস দেওয়া যায় কি না। মনে আছে, সত্যেন্দ্রনাথকে অনুরোধ করেছিলেম, তিনি স্বীকার করেছিলেন। কিন্তু চেষ্টা করেননি। তখন আমি নিজেই পরীক্ষা করেছি, 'লিপিকা'র অল্প কয়েকটি লেখায় সেগুলি আছে।"[২৩]

অর্থাৎ 'লিপিকার অল্প কয়েকটি লেখা' গদ্যকবিতা, সবগুলি নয়। প্রাবন্ধিক যেভাবে লিপিকার রচনাগুলিকে ভাগ করেছেন, তাতে তাঁর মননশীল রসগ্রাহীতা ও বিচারশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়।

গ্রন্থের নবম তথা শেষ প্রবন্ধটি 'পঞ্চভূত' বিষয়ক। সুখময় মুখোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'পঞ্চভূত' গ্রন্থটিকে তাঁর 'অন্যতম শ্রেষ্ঠ গদ্যগ্রন্থ' বলে উল্লেখ করেছেন। এই শ্রেষ্ঠত্বের মূলে যে গ্রন্থটির আঙ্গিকগত অভিনবত্ব রয়েছে, তাও ইঙ্গিত করেছেন তিনি। প্রবন্ধের শুরুতেই এই ভূতসভার সভাপতি ভূতনাথবাবুসহ পঞ্চভূত অর্থাৎ ক্ষিতি, স্রোতস্বিনী, দীপ্তি, সমীর, ব্যোম এদের পরিচয়, চারিত্রিক প্রবণতা, মতাদর্শগত অবস্থানগুলিকে তুলে ধরেছেন তিনি। 'পঞ্চভূত' গ্রন্থে লঘু কথোপকথনের মধ্য দিয়ে গুরু বিষয় আলোচনা প্রসঙ্গে প্রাবন্ধিক বঙ্কিমচন্দ্রের 'গৌরদাস বাবাজীর ভিক্ষার ঝুলি' গ্রন্থটির কথা উল্লেখ করেছেন এবং অনুমান করেছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বঙ্কিমচন্দ্রের কাছ থেকে এবিষয়ে প্রেরণা লাভ করেছিলেন। এরপরে 'পঞ্চভূত' গ্রন্থের রচনাগুলির সংক্ষিপ্তসার তুলে ধরে বিশদে আলোচনা করেছেন প্রাবন্ধিক। 'পঞ্চভূতে'র 'স্বচ্ছ ও সচ্ছন্দ' ভাষা কীভাবে দুরূহ বিষয়বস্তুর গুরুভার অনায়াসে বহনের উপযোগী হয়ে উঠেছে, সে বিষয়েও আলোকপাত করেছেন তিনি। 'পঞ্চভূত' কিছু পরিমাণে উপন্যাসধর্মী হয়ে উঠেছে বলে মনে করেছেন প্রাবন্ধিক। এরপরে তিনি আলোচনা করেছেন 'পঞ্চভূত' গ্রন্থের কথককে নিয়ে। তাঁর আলোচনা থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, কেবল ভূতনাথবাবু নন, এই গ্রন্থের সব চরিত্রই রবীন্দ্রসত্তার প্রতিনিধি। এরপরে প্রাবন্ধিক আলোচনা করেছেন 'পঞ্চভূতে'র পাঠান্তর নিয়ে। সবশেষে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের তথ্যসূত্র ব্যবহার করে 'পঞ্চভূত' গ্রন্থ-পরিকল্পনার উৎসটিকেও নির্দেশ করেছেন প্রাবন্ধিক—

> "রবীন্দ্রনাথ এবং তাঁর আত্মীয় ও বন্ধুরা 'পারিবারিক স্মৃতি' নামে যে খাতাটিতে নিজেদের মন্তব্য লিখতেন, তারই মধ্যে 'পঞ্চভূত' ভ্রূণের আকারে দেখা দেয়, তারপর সে 'সাধনা'র পৃষ্ঠার মধ্যে ভূমিষ্ঠ হয় এবং গ্রন্থের মধ্যে এসে পরিপূর্ণ যৌবন লাভ করেছে।"[২৪]

'পঞ্চভূত' গ্রন্থটির কিছু ত্রুটি বিচ্যুতিও তুলে ধরেছেন প্রাবন্ধিক, যেমন, কোথাও কোথাও এক পক্ষের যুক্তিই গুরুত্ব লাভ করেছে, বাস্তববাদী ক্ষিতির যুক্তিগুলি অনেক স্থানেই লেখকের সুবিচার লাভ করেনি। তাছাড়া কোনো কোনো চরিত্রের ভাষণ মাঝে মাঝে দীর্ঘ হয়ে যাওয়ায়, কথোপকথনের স্বচ্ছন্দ ভাবটি নষ্ট হয়েছে। প্রবন্ধের শেষে প্রাবন্ধিক পঞ্চভূত গ্রন্থের ভাষা ব্যবহারেও কয়েকটি ত্রুটির দিকে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এছাড়া সমীরের নাম সাধনায় ছিল সমীরণ, পঞ্চভূত গ্রন্থের 'অখণ্ডতা' শীর্ষক প্রবন্ধটিতে সমীরণ নামটি অসাবধানতাবশত থেকে গেলেও তা সুখময়বাবুর মতো প্রাবন্ধিকের তীক্ষ্ণ নজরকে এড়িয়ে যেতে পারেনি।

সুখময় মুখোপাধ্যায়ের আলোচ্য গ্রন্থটির একটি 'পরিশিষ্ট' অংশ রয়েছে, যেখানে প্রাবন্ধিক তাঁর 'লিপিকা' শীর্ষক প্রবন্ধটিতে সংযোজন করেছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'লিপিকা' গ্রন্থের 'অস্পষ্ট' শীর্ষক একটি রচনার উল্লেখ ছিল না সুখময় মুখোপাধ্যায়ের 'লিপিকা' শীর্ষক প্রবন্ধটিতে। গুরুত্ব বিবেচনায় এই লেখাটি সম্পর্কিত ভাবনা-চিন্তা প্রাবন্ধিক পরিশিষ্ট অংশে সংযোজন করেছেন। তাঁর মতে এই রচনাটির মধ্য দিয়েই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'লিপিকা'র সমস্ত রচনার প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যটিকে তুলে ধরেছেন। এরপরে প্রাবন্ধিক এই গ্রন্থের এক বিস্তারিত ও অভিনব

গ্রন্থপঞ্জি তুলে ধরেছেন। এই প্রবন্ধ গ্রন্থটিতে প্রাবন্ধিক রবীন্দ্র-সাহিত্যের যে সকল বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন, সেই বিষয়গুলি সম্পর্কিত অন্যান্য সকল গ্রন্থ ও প্রবন্ধের তালিকা তুলে ধরেছেন। এই গ্রন্থপঞ্জির অভিনবত্ব হল তালিকাবদ্ধ গ্রন্থ ও প্রবন্ধগুলি থেকে প্রয়োজনীয় অংশ উদ্ধৃতও করা হয়েছে। এতে উক্ত লেখকদের মূল বক্তব্যের পরিচয় যেমন সহজেই পাওয়া যায়, তেমনি একই বিষয়কে যে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে দেখা যেতে পারে সে সম্বন্ধে পাঠকের ধারণা তৈরি হয় বলে মনে করেছেন প্রাবন্ধিক।

সমালোচক সুখময় মুখোপাধ্যায়ের একটি বিশেষত্ব হল, তাঁর সমালোচনা কেবলই ইতিবাচক আলোচনা নয়; রীতিমতো গবেষণাধর্মী ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের মাধ্যমে তিনি নেতিবাচক দিকগুলিকেও তুলে ধরেন। তাই রবীন্দ্র-প্রতিভার পাশাপাশি সীমাবদ্ধতা গুলিকেও তিনি চিহ্নিত করেছেন; তথ্য-প্রমাণ সহযোগে খুব সাবলীলভাবে স্বীয় সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন; অকাট্যভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন নিজের মতকে। উল্লেখ্য, ভবতোষ দত্ত 'অধ্যাপক সুখময় মুখোপাধ্যায়' শীর্ষক লেখায় বলেছিলেন—

> "তাঁর কাছে যাঁরা এসেছেনতাঁর ব্যক্তিত্বের কয়েকটি দিকে তাঁরা অভিভূত হতেন। অসাধারণ ছিল তাঁর স্মৃতিশক্তি প্রায় কিংবদন্তীর মতো। যা পড়তেন কখনও ভুলতেন না। যা শুনতেন তা-ও নয়, তাঁর সঙ্গে কথা বলার এটাই বিপদ। একটু ভুল হলেই সংশোধন করে দিতেন। অনেক পণ্ডিতকেও তিনি আলোচনা সভায় অপ্রস্তুত করে দিয়েছেন ভুল ধরে দিয়ে।"[২৫]

তাঁর এই নির্ভীক তার্কিক সত্তাটি প্রবন্ধ রচনার ক্ষেত্রেও সদা জাগরুক থাকতো। তাই তাঁর এই গ্রন্থে নিছক ভাববাদী দর্শনের আলোকে রবীন্দ্র সাহিত্যের পর্যালোচনা নয়, বরং প্রাঞ্জল ও শাণিত গদ্যে রবীন্দ্র সাহিত্যের বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণ পাই আমরা। সুতরাং, বলার অপেক্ষা রাখে না যে, সুখময় মুখোপাধ্যায়ের 'রবীন্দ্র-সাহিত্যের নব রাগ' গ্রন্থটি নিঃসন্দেহে রবীন্দ্র-সাহিত্যচর্চার তথা বাংলা সমালোচনা-সাহিত্যের ঐশ্বর্য বৃদ্ধি করেছে।

তথ্যসূত্র

১. প্রমথনাথ বিশী, 'পরিচয়' শীর্ষক ভূমিকা, সুখময় মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্র-সাহিত্যের নবরাগ, ভারতী বুক স্টল, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ ১৩৬৭, পৃ. অনুল্লিখিত।

২. সুখময় মুখোপাধ্যায়, 'গ্রন্থকারের নিবেদন', পূর্বোক্ত 'রবীন্দ্র-সাহিত্যের নব রাগ', পৃ. অনুল্লিখিত।

৩. তদেব, পৃ. ৩।

৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিসর্জন, রবীন্দ্র-রচনাবলী, প্রথমখণ্ড, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলকাতা-১৭, সুলভ সংস্করণ শ্রাবণ ১৩৯৩, পুনর্মুদ্রণ আশ্বিন ১৪২৭, পৃ. ৫৩৪।

৫. সুখময় মুখোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত 'রবীন্দ্র-সাহিত্যের নবরাগ', পৃ. ২৮।

৬. তদেব, পৃ. ২৯।

৭. তদেব, পৃ. ৩০-৩১।

৮. তদেব, পৃ. ৩৬।

৯. তদেব, পৃ. ৩৯।

১০. তদেব, পৃ. ৪০।

১১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শারদোৎসব, রবীন্দ্র-রচনাবলী, চতুর্থ খণ্ড, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলকাতা-১৭, সুলভ

সংস্করণ ভাদ্র ১৩৯৪, পুনর্মুদ্রণ মাঘ ১৪২৮, পৃ. ৩৮৮।

১২. সুখময় মুখোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত 'রবীন্দ্র-সাহিত্যের নবরাগ', পৃ. ৪১।

১৩. তদেব, পৃ. ৪৭।

১৪. তদেব, পৃ. ৪৮।

১৫. তদেব, পৃ. ৫২।

১৬. তদেব, পৃ. ৫৮।

১৭. তদেব, পৃ. ৫৯।

১৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জাভা-যাত্রীর পত্র, রবীন্দ্র-রচনাবলী, দশম খণ্ড, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা-১৭, সুলভ সংস্করণ পৌষ ১৩৯৬, পুনর্মুদ্রণ বৈশাখ১৪২৯, পৃ. ৫৩৭।

১৯. সুখময় মুখোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত 'রবীন্দ্র-সাহিত্যের নবরাগ', পৃ. ৭২।

২০. প্রমথনাথ বিশী, পূর্বোক্ত 'পরিচয়' শীর্ষক ভূমিকা, পৃ. অনুল্লেখিত।

২১. সুখময় মুখোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত 'রবীন্দ্র-সাহিত্যের নবরাগ', পৃ. ৮৮।

২২. তদেব, পৃ. ৯৪।

২৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পুনশ্চ, রবীন্দ্র-রচনাবলী, অষ্টম খণ্ড, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলকাতা-১৭, সুলভ সংস্করণ ফাল্গুন ১৩৯৫, পুনর্মুদ্রণ শ্রাবণ ১৪২৬, পৃ. ২৩১।

২৪. তদেব, পৃ. ১৫৬।

২৫. ভবতোষ দত্ত, 'অধ্যাপক সুখময় মুখোপাধ্যায়', আশিস চক্রবর্তী ও অন্যান্য সম্পাদিত, স্মারকপত্র, সপ্তবিংশতিতম পুনর্মিলন উৎসব, বাংলা বিভাগ, বিশ্বভারতী, ২৩শে জানুয়ারি ২০০৬, পৃ. অনুল্লিখিত।

শিউলি বসাক
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ,
কালীগঞ্জ সরকারি মহাবিদ্যালয়, নদীয়া

স্মৃতিকথায় 'বনের খবর' : একটি নিবিড় পাঠ

বিজয় দাস

সারসংক্ষেপ : উনিশ শতকের বাংলার সাংস্কৃতিক তথা সাহিত্য জগতে দুটি পরিবারের নাম উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের মতো বিরাজ করছে। একটি ঠাকুর পরিবার, আরেকটি রায়পরিবার—এটি সবাই একবাক্যে স্বীকার করে নেন। বাংলা শিশু-কিশোর সাহিত্যের আলোচনায় রায়-পরিবারের উপেন্দ্রকিশোর, সুকুমার রায়, সত্যজিৎ রায়, লীলা মজুমদারের পাশাপাশি যাঁর নাম অবশ্যই শ্রদ্ধার সঙ্গে সারণীয় তিনি এই রায়চৌধুরী পরিবারের প্রমদারঞ্জন রায়। যাঁর 'বনের খবর' বাংলা শিশু-কিশোর সাহিত্যে অমূল্য সম্পদ রূপে আজও বিশেষ মূল্যবান। লীলা মজুমদার তাঁর 'পাকদণ্ডী' গ্রন্থে লিখেছিলেন, 'এমন তথ্যে, এমন সরসতায়, এমন পৌরুষে পরিপূর্ণ বই বাংলায় বেশি নেই।' সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার কাজে প্রমদারঞ্জন ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত, উত্তর-পূর্ব, বর্মার দুর্গম পাহাড় জঙ্গলে দীর্ঘদিন ঘুরেছেন। সেই সব বিচিত্র অভিজ্ঞতার রোমাঞ্চকর গল্প তিনি শুনিয়েছেন অত্যন্ত আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে। বস্তুত মানুষটি ছিলেন প্রাণপ্রাচুর্যে পরিপূর্ণ। কেবল শিশুদের জন্য নয় বিভ্রান্ত মানুষের মন ও মননে শৈশবের ছোঁয়া জোগানোর জন্য শিশুসাহিত্যিক প্রমদারঞ্জন রায়ের মূল্যায়ন আজ অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক বলেই আমাদের মনে হয়। "স্মৃতিকথায় বনের খবর : একটি নিবিড় পাঠ" শিরোনামে লেখা নিবন্ধটি সাহিত্যিক প্রমদারঞ্জন রায়ের 'বনের খবর' গ্রন্থের পুনর্মূল্যায়ন।

সূচক শব্দ : সার্ভেয়ার, শান স্টেট, লুশাই পাহাড়, মিকির হিলস, বেলুচিস্তান।

মূল আলোচনা :

প্রমদারঞ্জন রায়ের জন্ম পূর্ববঙ্গের ময়মনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জ মহকুমার মসুয়া গ্রামে ১৯শে জুন, ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দে। ময়মনসিংহ জেলা সে সময়কার বাংলাদেশের অন্যতম উল্লেখযোগ্য ভৌগোলিক দিক থেকে নদীবেষ্টিত, ঘন জঙ্গলে পূর্ণ। সেই সঙ্গে বন্য হাতি ও অন্যান্য জীবজন্তুরও মাঝে মাঝেই লোকালয়ে দেখা মিলত, তেমনি সাংস্কৃতিক দিক থেকেও তা গান-গল্পের দেশ হিসাবে পরিচিত ছিল।

প্রমদারঞ্জন রায় ছিলেন কালিনাথ রায়ের কনিষ্ঠ পুত্র, বিখ্যাত শিশুসাহিত্যিক উপেন্দ্রকিশোরের ভাই। তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা গ্রামের বিদ্যালয়ে। পরে কলকাতা মেট্রোপলিটন থেকে তিনি এণ্ট্রান্স ও এফ.এ পাস করেন। এরপর শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ থেকে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং এর ডিগ্রি লাভ করেন এবং সরকার জরীপ বিভাগে চাকরি নেন।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে রচিত প্রমদারঞ্জন রায়ের 'বনের খবর' অসামান্য একটি স্মৃতিকথা। দুর্গম অরণ্য ও মরুভূমিপ্রায় অঞ্চলে জমি জরিপকালীন রোমাঞ্চকর সব অভিজ্ঞতার কাহিনি রয়েছে এই গ্রন্থে। ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯২০ খ্রিস্টাব্দ—এই দীর্ঘ একুশ বছর প্রমদারঞ্জন সার্ভে অফ ইণ্ডিয়ার কাজে ব্রহ্মদেশ, বেলুচিস্তান, আসাম, খাসিয়া, জৈন্তিয়া পাহাড়, ত্রিপুরা রাজ্য, লুশাই হিলস, নাগা হিলস বিভিন্ন দুর্গম উপত্যকায় বহু বিপদ সংকুল পরিবেশকে

দাস, বিজয় : স্মৃতিকথায় 'বনের খবর' : একটি নিবিড় পাঠ
Open Eyes : Indian Journal of Social Science, Literature, Commerce & Allied Areas, Volume 22, No. 1, June 2025, Pages : 35-39, ISSN : 2249-4332

হেলায় তুচ্ছ করে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে কাজ করেন। স্মৃতি বিজড়িত সেই দুঃসাহসিক ঘটনা, দুর্গম পথের বর্ণনা, বিভিন্ন প্রজাতির জন্তু জানোয়ার, বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসীদের নানা গল্প 'সন্দেশ'-এর পাতায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করতে শুরু করেন 'বনের খবর' নাম দিয়ে। সাহিত্যিক লীলা মজুমদার লিখেছেন—

> "মুকুলে' একবার কিছু বেরিয়েছিল। পুরনো 'সন্দেশে' পত্রিকায় সবটা বেরোয়নি। আমি বাবার হাতে লেখা খাতা সিগনেট প্রেসকে দিয়েছিলাম। ওঁরা তার থেকে নকল করে নিয়ে খাতা আমাকে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন।"

প্রমদারঞ্জনের মৃত্যুর পর 'সন্দেশ' ও 'মুকুলে' প্রকাশিত কিছু রচনা এবং অপ্রকাশিত আরো কিছু অংশ নিয়ে 'বনের খবর' গ্রন্থাকারে সিগনেট প্রেস থেকে ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল।

বিখ্যাত সাহিত্যিক লীলা মজুমদারের আত্মজীবীমূলক রচনা 'পাকদণ্ডী' থেকে একটি পংক্তি উদ্ধৃতি করে নিবন্ধের মূল বিষয়ে প্রবেশ করবো। লেখিকা বলেছেন—

> "কিন্তু যেই না সন্ধ্যাবেলায় আমাদের স্কুলের পড়া তৈরি হয়ে যেত, বালিশে ঠেস দিয়ে বসা বাবা অন্য মানুষ হয়ে যেতেন। তখন আমরা তাঁর কোলে, পিঠে, পেটের ওপর চেপে বসে, গল্প শুনতাম। সব সত্যি গল্প। দেশে বাবাদের ছোটবেলার গল্প; জরীপ বিভাগে কাজ করতে গিয়ে ঘোর বেঘো জঙ্গলে বাবার নানান লোমহর্ষক অভিজ্ঞতার গল্প; কত হাসির, কত কান্নার গল্প। অমন গল্প বলতে পারে আমি সারা জীবনে আর একটিও লোক পাইনি। বাবার ডাইরি থেকে তুলে "বনের খবর" প্রকাশ করেছিলেন সিগনেট প্রেস।"

এই বই প্রসঙ্গে তিনি আরও জানিয়েছেন, "এমন তথ্যে, এমন সরসতায়, এমন পৌরুষে পরিপূর্ণ বই বাংলায় বেশি নেই।"

'বনের খবর' আঠারোটি অংশে বা পরিচ্ছেদে বিভক্ত। প্রথম পরিচ্ছেদে লেখক জানিয়েছেন, যারা জরীপের কাজ করে, তাদের অনেককেই ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর সব জায়গায় ঘুরে বেড়াতে হয়। বন্য হিংস্র হাতি, মহিষ, বাঘ, ভাল্লুক, গণ্ডার চলাফেরা করে আর যেখানে এইসব নেই সেখানে তাদের থেকেও হিংস্র আর ভয়ানক মানুষ থাকে। জরীপ করার জন্য সার্ভেয়ার, আমিন খালাসী ও চাকর বাকর বিস্তর থাকে। একই সঙ্গে গভীর গহন জঙ্গলের মধ্যে তাঁবু খাটিয়ে থাকতে হয়। জঙ্গল এমনই অন্ধকার যেখানে সূর্যের আলো পর্যন্ত প্রবেশ করেনা। চলবার পথ নেই জঙ্গল কেটে রাস্তা তৈরি করতে হয়। রোমহর্ষক সেই অভিজ্ঞতার কথা বলতে গিয়ে লেখক জানিয়েছেন—"এমনি বিশ্রী জায়গা! প্রথম-প্রথম এই সব জায়গায় সহজেই ভয় হত। আমার মনে আছে প্রথম বছর যখন শান স্টেটে যাই, আমার তাঁবুর সামনে একটা বাঘ ফোঁস ফোঁস করে নিশ্বাস ফেলছিল, আমি তা শুনে বড়ই ব্যস্ত হয়েছিলাম। তারপর, এর চেয়েও কত বড়-বড় ঘটনায় পড়েছি কিন্তু তেমন ব্যস্ত কখনো হইনি।" (৮)

দেরাদুনে প্রায় একবছর থাকার পর ১৮৯৯-১৯০০ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ ব্রহ্মদেশ শান স্টেটে বদলি হলেন। দেরাদুন থেকে কলকাতা, তারপর জাহাজে রেঙ্গুন, রেঙ্গুন থেকে আবার রেলপথে থাজি জংশন, মিকটিলা রোড। তারপর হাঁটা পথে শান স্টেট। এই শান স্টেটের প্রধান শহর টাউংদী।

'বনের খবর' গ্রন্থে সার্ভের কাজে লেখক বিভিন্ন অঞ্চলের এক স্থান থেকে অন্য স্থানে ঘুরে বেড়িয়েছেন। কখনও ব্রহ্মদেশ, কেংটুং রাজ্য আবার কখনও বা বেলুচিস্তানের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, পূর্ববঙ্গ, আসাম, ত্রিপুরা, লুশাই হিলস, জৈন্তিয়া পাহাড় প্রভৃতি জায়গায়। এই সমস্ত অঞ্চলে চাক্ষুষ দেখা বাস্তব অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ

কাহিনি লেখকের স্মৃতিপটে উজ্জ্বল আর তারই প্রকাশ আলোচ্য গ্রন্থে।

'বনের খবর' গ্রন্থের প্রথম পরিচ্ছেদ থেকে আঠারো সংখ্যক পরিচ্ছেদ পর্যন্ত বিশ্লেষণ করলে দুর্বোধ্য প্রকৃতি, বন্য জন্তুর পাশাপাশি একাধিক চরিত্র এসেছে। চরিত্রগুলো স্বল্প পরিসরে এসে হাজির হলেও এদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণ আলাদা। কারোর মধ্যে আছে সাহসিকতা, কারোর বিশ্বাস, কারোর চাতুরতা, আবার কেও বা অভ্যন্ত ভীতু স্বভাবের। একদিকে জঙ্গলের ভয়ঙ্কর রূপ আর তারই পাশাপাশি বিচিত্র মানব চরিত্র গল্পগুলোকে অন্যমাত্রা দিয়েছে। সার্ভেয়ার জাফর হুসেন, হাবিলদার সিংবীর থাপা বুড়ো সার্ভেয়ার রামশবদ, আর তার দুই চাকর সুচিত আর বেণী, শিবদয়াল, আমির আহম্মদ, ভিখারী, চাকর শশী এছাড়াও দোভাষী খালাস এবং কুলিদের সুখ-দুঃখ, হতাশা, যন্ত্রণায় জর্জরিত জীবন বিশ্বাস যোগ্যতায় ফুটে উঠেছে। দেরাদুন ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের ডেপুটি কনজারভেটার রায়বাহাদুরের কথা বলতে গিয়ে লেখক জানিয়েছেন—

> "রায়বাহাদুর ছিলেন পাকা শিকারী। বাঘ, ভাল্লুক অনেক শিকার করেছেন তিনি। তাঁর কাছে অনেক শিকারের গল্প শুনেছিলাম।"

গল্পের সূত্রধরেই এসেছে খালাসী শিবদয়ালের প্রসঙ্গ। খালাসী শিবদয়াল নতুন লোক আর ছেলে মানুষ। 'কালা' পাহাড় চড়বার দিন এল। অথচ শিবদয়াল নেই। লেখক শিবদয়ালের কথা বলতে গিয়ে লিখেছেন, "আরে শিবদয়াল কোথা?" তখনই শিবদয়াল বলে উঠলো, "বহুত পেটমে দরদ হায়, হুজুর সিধা হোনে নেহি সকতা হু।" ... আসলে পুরোটাই তার অভিনয়। অন্য খালাসীরা বলেছিল—হুজুর ওর পেট ব্যথা তো হয়নি। পাহাড় দেখে ভয় পেয়ে চড়াই বাঁচাবার জন্য পেট ব্যথার ভান করেছিল।

'বনের খবর' গ্রন্থে লেখক শিশু-কিশোর উপযোগী ভাষা ব্যবহার করেছেন। শিশুরা যে ভাষা পছন্দ করে বাঘের 'হিয়াও' ডাক, কুকুরের 'ক্যাও ক্যাও', ময়ূরের ডাক, ময়ূরের বাচ্চার 'চি চি', শুয়োরের 'ঘোৎ, ঘোৎ' আওয়াজ, নদীর পাড়ে উড়ে যাওয়া হাঁসের শো শো শব্দ, সারস পাখির 'ক্রা-আ-আ' ডাক ছোটদের আনন্দ দেয়। এরই পাশাপাশি হিন্দি বাংলা মিশ্রিত এক মিশ্রভাষা ব্যবহারে নির্ভেজাল হাস্যরসে উদ্রেক করেছে 'জলদি আও, জলদি আও'। লোকগুলো ততই খালি বলে 'আতা হুঁ।' আবার জিজ্ঞাসা করে কেয়া হুয়া ? লেখক উত্তর দিয়েছে—'তুমহারা নানা হিয়া বৈঠা হ্যাঁ।' আবার রায়বাহাদুরের ভাইপোর বাঘ শিকার প্রসঙ্গে এসেছে 'বাবুর মুখ দিয়ে কোনো কথা বের হয়না, খালি ঐ মুখ চাপা গোঁ গোঁ শব্দ।' ... এ যেন গল্পচ্ছলে পাঠককে হাসির জোগান দেওয়া।

বন্যপ্রাণীর সঙ্গে সঙ্গে শান, মুসো, পালাউং, কুই প্রভৃতি ব্রহ্মদেশের স্থানীয় অধিবাসীদের সামাজিক জীবন যাত্রার নানা তথ্য ও গল্প সরসভাবে ফুটে উঠেছে। তাদের বিশ্বাস, খাদ্য, রন্ধন প্রণালী, সংশয় সবটাই যেন গল্পচ্ছলে উঠে এসেছে। লেখকের বর্ণনায়—

> "ঐ পাহাড়ের উপর মুসোদের গ্রাম। সেই দেশে শান ছাড়া মুসো, পালউং, কুই প্রভৃতি অনেক জাতির লোক বাস করে। ... শিকার করে আর মাংস খায় হাতি, ঘোড়া, বাঘ, ভাল্লুক থেকে আরম্ভ করে কাঠবিড়ালি অবধি বাদ দেয় না।"

এরা সাধারণত শিকার করে জীবন ধারণ করে। জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরে বেড়ায়, নানারকম জানোয়ার শিকার করে, নানারকম পাখি এনে পোষে। এরা খুবই সাহসী। এদের গ্রামগুলি দূর থেকে বেশ সুন্দর দেখায় পাহাড়ের মাথায় উঁচু করে মাচার উপর সরি সরি বাঁশের ঘর। গ্রামের যিনি প্রধান তিনি একটা বড় সুন্দর পাখি পুষতেন। লেখকের বর্ণনায়—

"শাদা ধবধবে, মোরগের মতো লেজ, শাদার উপর কালো কালো কারিকুরি, যেন তুলি দিয়ে আঁকা, ডানায়ও ঠিক তেমনি কারিকুরি। লেজের দুটি পালক খুব লম্বা, গলাটি ঘোর নীল আর চকচকে, মাথায় ঘোর নীলরঙের ঝুঁটি।"

গল্পকথক আড়াই টাকায় পাখিটি কিনলেও শেষ পর্যন্ত বাঁচাতে পারেননি। হয়তো খাঁচায় বন্ধ রাখাতে তার মন ভেঙে গিয়ে থাকবে। হয়তো বা মনিবের সঙ্গে এই বিচ্ছেদ যন্ত্রণাকে সে মেনে নিতে পারেনি। 'বনের খবর' গ্রন্থে কুলিদের কষ্টকর জীবনযাত্রা প্রসঙ্গে উঠে এসেছে তাদের রন্ধন প্রণালীর কথা। লেখকের স্মৃতিকথায় উঠে এসেছে— "জঙ্গলে থাকার সময় শান কুলিরা হাঁড়ি বা কড়া কিংবা অন্য বাসন কোসন নিয়ে যেত না। ভাত রান্নার কৌশলটিও বেশ চমৎকার। একটা লম্বা কাঁচা বাঁশের চোঙার একটি বাদে সমস্ত গাঁটগুলিকে ফুটো করে, সেটাকে ধুয়ে পরিষ্কার করে নিয়ে, তাতে আবশ্যক মতো চাল পুরে, জল ভরে, ঘাস-পাতা দিয়ে মুখটা বন্ধ করে একটা গাছে হেলান দিয়ে দাঁড় করিয়ে রেখে দেয়।" তিন চার ঘন্টা থাকার পর চোঙ্গাটা ধুনির আগুনে ঝলসানো হয়। ঠাণ্ডা হলে বাঁশটিকে চিরে ফেলে ভাত বের করা হয়। তারপর সেটাকে নুন, লঙ্কা, শুকনো মাছ বা মাংস দিয়ে এঁরা কোনরকমে খিদে মেটায়। এমনকি গরমের দিন ঝিঁঝিঁ পোকা ধরে সেগুলোকে আগুনে পুড়িয়ে তারা চাটনি করে খায়।

প্রত্যন্ত অঞ্চলের অধিবাসীদের শিকারের নানা কাহিনি এসেছে। ১৪ সংখ্যক পরিচ্ছেদে 'শুয়োর শিকারের' নানা কায়দার কথা এসেছে। ... "কোথাও হয়তো ঘোড়ায় চড়ে বল্লম দিয়ে শিকার করে, কোথাও বা জাল দিয়ে ঘিরে ফেলে, তাড়া করে সেই জালে ফেলে বর্ষা দিয়ে মারে, আর যাদের সে সাহস নেই তারা দূর থেকে বন্দুক চালায়।"

গল্পকথক লুশাই পাহাড়ে বাঘ মারবার এক মজার ফন্দি দেখেছিলেন। বনের ভিতর বাঘ, ভাল্লুক চলবার পথ আছে, কোন পথ দিয়ে ব্যাঘ্র বেশি যাতায়াত করে লুশাইরা আগে সেই খোঁজ নেয়। তারপর সেই পথের ধারে যেখানে পাহাড়ের গা খুব ঢালু, সেখানে কোদাল দিয়ে খুঁড়ে আরো বেশি খাড়া আর গভীর গর্ত করে রাখে। তারপর লম্বা লম্বা বাঁশের খোঁটা পুতে ঐ গর্তের উপর রাস্তায় বরাবর সমান করে মাচা বাঁধে। মাচার নিচে অবশ্য ফাঁক থেকে, আর তার নীচে মাটিতে এই বড় বড় ভীষণ ধারাল বল্লম পোঁতা থাকে। মাচার উপর বেশ মোটা মোটা শুয়োর ছানা বা কুকুর বেঁধে রাখা হয়। বাঘমশায় হেলতে দুলতে হালুম করে লাফ দেয় আর হুড়মুড় করে মাচা ভেঙে এক্কেবারে বল্লমের উপর পড়ে। ... তারপর যতই হাত-পা ছোঁড়ে আরও বল্লম গায়ে বিধতে থাকে, ঘন্টা কয়েকের মধ্যে সব শেষ।"

বাঘ, শুয়োর শিকারের সঙ্গে এসেছে ভেলা শিকারের কাহিনি। বিছানায় শুয়ে থাকার সময় শুনতে পেলেন ফরফর 'শো শো' শব্দ। জিজ্ঞাসা করলেন—'কিয়া হ্যাঁ রে?' আসল 'ভেলা হ্যায় হুজুর।' ... মাথার উপর দিয়ে তখন 'শো শো' শব্দে শত শত পাখি হাঁস ভেলা ইত্যাদি উড়ে যাচ্ছে। এদের শিকার করা অসম্ভব কারণ কুয়াশায় চারিদিকে ভালো করে দেখা যাচ্ছে না। তবুও ভেলা শিকার করা হলো—'ভেলাগুলো বড়ই ব্যস্ত, আমাদের লক্ষ্যই করছে না। আমরা খুব কাছে পৌঁছে গেছি। ত্রিশ-বত্রিশ গজ হবে, জালের উপর, ডানা খোলা অবস্থায়। তাদের মাঝখানটা লক্ষ্য করে গুলিভরা কার্তুজ ছেড়ে দিলাম কয়েকটা পাখি এলিয়ে পড়ল, আর বাকিগুলো শো শো করে উড়ে গেল।' এমনই সব চমৎকার গল্প। রায়-পরিবারের নিজস্ব চেনা ছন্দ, গল্প বলার সেই চেনা সুর।

ত্রিপুরা রাজ্যের ফুর্কীদের গ্রাম এদের জীবনে খুব কষ্ট। অভাব-অনটনের সঙ্গে ছিল হিংস্র জন্তুর অত্যাচার। এদের কথা বলতে গিয়ে গল্প কথক বলেছেন—

"এদের বড় কষ্ট। বর্ষাকালে সব জ্বরে মরে তার উপর হাতি, শুয়োর এসে ধান খেয়ে যায়। তৈরি

ফসল দিনের বেলা তারা ধান কার্টে, আবার রাত জেগে পাহারা দেয়, নইলে হরিণ আর শুয়োর সব খেয়ে যাবে, কিছু রাখবে না।"

১৭ সংখ্যক পরিচ্ছদে লুশাই পাহাড়ে কাজ করার সময়ের একটি প্রসঙ্গ স্বাভাবিকভাবেই পাঠকের মনে সহজেই দাগ কাটে। যেখানে একদিন তাঁবুতে বসে চা খাওয়ার সময় গল্পকথক কান্নার শব্দ শুনতে পেয়ে টিডেলকে জিজ্ঞাসা করেন, 'কে কাঁদছে?' এর উত্তরে টিণ্ডেল জানায় হুজুর হল্লুমান রোতা হ্যায়।' পরে তিনি এই জানতে পারেন যে, হাতির মাহুতরা একটা হনুমানের বাচ্চা জঙ্গল থেকে ধরে নিয়ে এসেছিল তাই ওর মা বাচ্চাটাকে খুঁজতে খুঁজতে তাঁবু পর্যন্ত চলে আসে। সন্তানের প্রতি মায়ের এই টান লেখককে আশ্চর্য করেছিল। হনুমানের মায়ের কষ্ট অনুভব করে শেষ পর্যন্ত তিনি বাচ্চাটিকে মায়ের কাছে রেখে আসতে হুকুম দেন। বাচ্চাটিকে পাওয়ার পর তার মা- বাবা দুজনে কতরকম করে যে বাচ্চাটাকে আদর করলো এবং তারপর তাকে নিয়ে তারা লাফাতে লাফাতে গভীর বনে চলে গেল। এই রকমই কত ছোট্ট ছোট্ট ঘটনা ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে 'বনের খবর' গ্রন্থে।

বাইশ-তেইশ বছর জরীপের কাজে নানা প্রদেশ লেখক ঘুরেছেন। কত নতুন নতুন জায়গা কত বন জঙ্গল। গল্পকথক অকপটে স্বীকার করেছেন আসামের নাম্বারের মত জঙ্গল কোথাও তিনি দেখেননি।

বহু তথ্যের সমাবেশ থাকলেও 'বনের খবর' বিবরণধর্মী রচনা একেবারেই নয়। লেখক যেন এখানে প্রত্যক্ষদর্শী গল্পকথক মাত্র। তিনি গল্প বলছেন আর পাঠক আগ্রহ সহকারে গল্প শুনছে। রায় পরিবারের উত্তরাধিকার বহন করে তিনিও পৌঁছে গেছেন কালান্তরের পথে। রায় পরিবারের উত্তরাধিকার হিসাবে প্রমদারঞ্জন রায়ের লেখা একটি মাত্র গ্রন্থ 'বনের খবর' তাঁকে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় করে রেখেছে।

আকর গ্রন্থ :

১. লীলা মজুমদার, 'পাকদণ্ডী', আনন্দ পাবলিশার্স, ৪র্থ মুদ্রণ, ২০০১।
২. ব্রততী চক্রবর্তী, 'বাংলা শিশুসাহিত্যচর্চা : রায় পরিবার' দে বুক স্টোর, ১৯৯৭।
৩. তিস্তা দত্ত রায়, 'বাংলা শিশুসাহিত্য রায়বাড়ি ও পরম্পরা', বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ১ম প্রকাশ, ২০১৪।
৪. প্রমদারঞ্জন রায়, 'বনের খবর', সিগনেট প্রেস, প্রথম প্রকাশ, ১৯৬৩।
৫. পুণ্যলতা চক্রবর্তী, 'ছেলেবেলার দিনগুলি', আনন্দ পাবলিশার্স, ২০১৬।

বিজয় দাস
গবেষক, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়
পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ।

Hydro Diplomacy as a Tool for Energy Cooperation in India-Bhutan Relations : An Evaluation

Anshu Yadav

"Diplomacy is the art of bringing different elements of national power into harmony with each other." —Hans Morgenthau

Abstract :

Hydropower diplomacy plays a pivotal role in India-Bhutan relations, fostering energy cooperation, economic growth, and regional stability. India's Himalayan states have a hydropower potential of 104.437 GW, yet much remains untapped. Bhutan, with its abundant river systems, has strategically collaborated with India to harness hydropower, reinforcing bilateral ties. This aligns with Robert Keohane's liberal institutionalism, which posits that "international institutions facilitate cooperation by reducing uncertainty." India's support in developing Chhukha, Tala, and Mangdechhu projects exemplifies this approach, enhancing energy security and diplomatic trust. From a realist perspective, Hans Morgenthau argues that "international politics is a struggle for power." India's investment in Bhutan's hydropower not only ensures energy imports but also counters regional influence from China, securing its strategic interests. Over 70% of Bhutan's electricity is exported to India, demonstrating how energy interdependence strengthens bilateral relations. The India-Bhutan energy partnership extends beyond economic transactions to mutual trust, reinforcing Wendt's notion that "anarchy is what states make of it." Through sustained collaboration, both nations construct an interdependent energy framework that fosters regional stability. Hydropower diplomacy in India-Bhutan relations stands as a model for regional energy cooperation, balancing national interests with sustainable development. As India expands its hydropower capabilities, deeper collaboration with Bhutan can enhance South Asia's energy security and integration. All these points have been discussed in this research paper.

Keywords : Hydropower diplomacy, India-Bhutan relations, energy security, bilateral

---

Yadav, Anshu : Hydro Diplomacy as a Tool for Energy Cooperation in India-Bhutan Relations : An Evaluation
Open Eyes : Indian Journal of Social Science, Literature, Commerce & Allied Areas, Volume 22, No. 1, June 2025, Pages : 40-49, ISSN : 2249-4332

Introduction :

India and Bhutan share a deep-rooted relationship built on historical, cultural, economic, and strategic ties. Bhutan's geographical location makes it strategically important for both India and China. It shares borders with India's northeastern states, including Arunachal Pradesh, Assam, West Bengal, and Sikkim. Positioned between India and China, Bhutan acts as a buffer state, playing a crucial role in regional security and geopolitical balance. Additionally, its Himalayan location makes it significant in terms of environmental and water security, impacting the interests of both India and China.

As close neighbors, their friendship is based on mutual trust, non-interference, and shared interests in regional stability and development. India has played a crucial role in Bhutan's modernization journey, providing economic assistance, infrastructure development, and support in key sectors like hydropower. The 1949 Treaty of Friendship, revised in 2007, reflects the evolving nature of their partnership, ensuring Bhutan's sovereignty while strengthening bilateral cooperation. Hydropower has emerged as a cornerstone of this relationship, making energy diplomacy a key driver of their economic and strategic engagement.

As Hans Morgenthau stated, "Diplomacy is the art of bringing different elements of national power into harmony with each other." This is evident in India-Bhutan relations, where diplomacy has successfully blended economic and strategic interests for mutual benefit.

Hydropower has emerged as a cornerstone of this relationship, making energy diplomacy a key driver of their economic and strategic engagement. Joseph Nye's concept of "soft power" is particularly relevant here, as India's support for Bhutan's hydropower sector exemplifies how cooperation in energy can strengthen regional ties without coercion. Over the years, India and Bhutan have continuously adapted their energy cooperation to evolving geopolitical and economic realities, ensuring long-term stability and shared growth. Water resources play a pivotal role in shaping bilateral relations, especially in regions where hydropower is a significant source of energy. The India-Bhutan relationship serves as a prime example of hydro-diplomacy facilitating energy cooperation, economic growth, and strategic partnership. Bhutan's abundant hydropower potential and India's energy demand have created a mutually beneficial dynamic, where hydro-diplomacy acts as a strategic tool for deepening ties.

India and Bhutan share a long-standing hydropower cooperation framework, marked by agreements such as the 2006 Agreement on Cooperation in Hydropower and the 2014 Framework Agreement on Joint Venture Hydropower Projects. These agreements underscore the commitment of both nations to sustainable energy collaboration, regional stability, and economic interdependence. India has supported Bhutan in developing its hydropower sector through financial and technical assistance, with projects like Tala, Chhukha, and Punatsangchhu playing a crucial role in Bhutan's economy and

India's energy security.Despite these successes, challenges remain. Concerns over environmental sustainability, financial dependence, and evolving geopolitical considerations require a reassessment of the existing hydro-diplomatic framework. As Bhutan diversifies its energy strategy and India strengthens its regional energy security, evaluating the effectiveness of hydro-diplomacy in sustaining long-term energy cooperation becomes imperative. This paper examines the role of hydro-diplomacy in India-Bhutan relations, its impact on energy security, and the challenges that must be addressed to enhance future collaboration.

The historical relationship between India and Bhutan has evolved over time. In ancient times, Buddhism spread from India to Bhutan, laying cultural foundations. During British rule, Bhutan became a British protectorate. In 1949, the Treaty of Friendship placed Bhutan's foreign and defence policy under India's guidance. This treaty was revised in 2007, allowing Bhutan greater autonomy, with India retaining control only over defence matters. A significant development occurred during the 2017-18 Doklam crisis, where India and Bhutan confronted China over a border dispute, underscoring the strategic partnership between India and Bhutan.

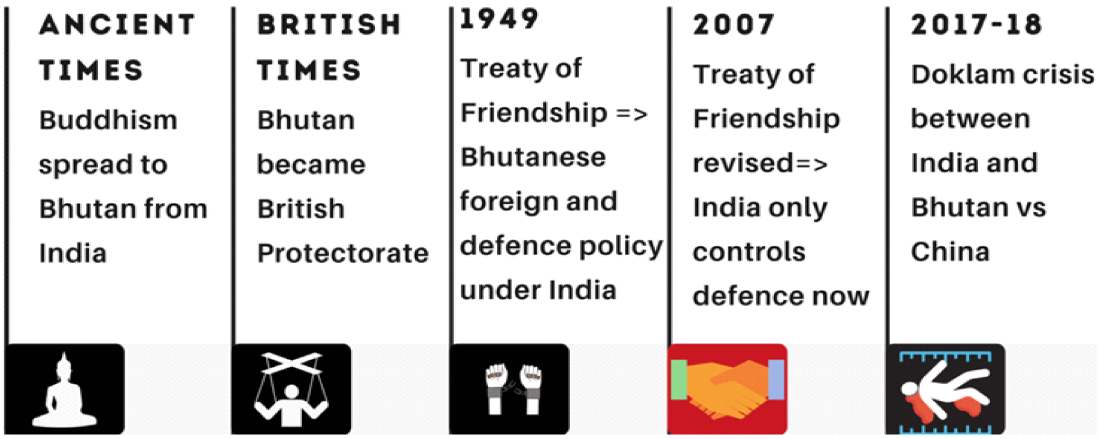

FIG- 1

What is Hydro Diplomacy ?

Hydro diplomacy refers to the strategic use of diplomatic efforts to manage and utilize shared water resources between nations. It plays a crucial role in fostering cooperation, preventing conflicts, and ensuring sustainable water management, especially in regions where rivers cross international borders.

Beyond bilateral engagements, hydro diplomacy plays a critical role in regional stability, climate resilience, and sustainable development. Effective water-sharing agreements can mitigate geopolitical tensions, ensuring that nations equitably manage their shared resources. With climate change altering rainfall patterns and increasing water-

related challenges, diplomatic negotiations become even more crucial. By fostering transparent dialogue, technological collaboration, and institutional frameworks, hydro diplomacy can transform water from a potential source of conflict into a tool for cooperation and regional integration.

India-Bhutan Hydro Cooperation

India and Bhutan share a strong partnership in hydro diplomacy, primarily centered around hydropower development. Bhutan is one of India's key cross-border energy trading partners. Over the years, the two countries have been engaged in bilateral trading, with India importing a significant quantum of power generated from Bhutan's hydropower projects.

India-Bhutan Energy Cooperation (Hydropower Projects) - Year-wise key details

Year	Project	Capacity (MW)	Key Details
1961	Jaldhaka Hydropower Project	~27 MW	First Indo-Bhutan hydro cooperation; located in West Bengal, power exported to Bhutan
1987	Chukha Hydropower Project (CHP)	336 MW	Bhutan's first mega project, funded by India (60% grant, 40% loan at 5% interest).
2006	Bilateral Agreement on Hydropower Cooperation	N/A	Framework for scaling cooperation in hydropower sector.
2008	Protocol to 2006 Agreement	10,000 MW target	Target set to develop 10,000 MW of capacity by 2020; Empowered Joint Group established
2006-2017	Tala Hydroelectric Project	1,020 MW	One of the biggest joint projects, India funded (60% grant, 40% loan).
2014	Framework Inter-Governmental Agreement (JV model)	4 projects totaling 2,120 MW	Agreement to develop Kholongchhu, Bunakha, Wangchu, and Chamkarchu projects via PSUs

Year	Project	Capacity (MW)	Key Details
2014	Kholongchhu Hydroelectric Project (foundation laid)	600 MW	Launched by PM Narendra Modi; JV between SJVNL (India) & Druk Green Power Corp (Bhutan).
2019	Mangdechhu Hydroelectric Project (inaugurated)	720 MW	Jointly inaugurated by Indian and Bhutanese PMs
2020	Concession Agreement for Kholongchhu signed	600 MW	Virtual signing of agreement agreement for the project.
2022	Punatsangchu II (under construction)	1,020 MW	As of December 2024, Bharat Heavy Electricals Limited (BHEL) has successfully commissioned the first two units of the 6x170 MW Punatsangchhu-II Hydroelectric Project (PHEP-II) in Bhutan
2024/2025 (ongoing)	Punatsangchu I (under construction)	1,200 MW	Scheduled completion by 2024/2025.

India and Bhutan's hydropower cooperation began in 1961 with the Jaldhaka project, which supplied power from India to Bhutan. The relationship deepened in 1987 with the commissioning of the Chukha Hydropower Project (336 MW), Bhutan's first major project fully supported by India. This success led to the Tala Hydroelectric Project (1,020 MW), another milestone fully funded by India on a similar 60% grant and 40% loan model.

The two nations formalized their energy cooperation through an agreement in 2006, later expanding their ambitions in 2008 with a commitment to develop 10,000 MW by 2020. Several projects were agreed upon, including the 600 MW Kholongchhu project, initiated in 2014 and later formalized via a concession agreement in 2020. The Mangdechhu project (720 MW) was completed in 2019, followed by ongoing construction of the 1,020 MW Punatsangchu II and 1,200 MW Punatsangchu I projects.

India has recently showcased its strides in green hydrogen technology by unveiling a hydrogen-powered bus, underlining its commitment to advancing sustainable mobility and clean energy innovation. In discussions with Bhutan, India not only reiterated its focus on eco-friendly energy solutions but also conveyed a strong willingness to

deepen bilateral cooperation in the energy domain. Bhutan, in turn, expressed enthusiasm for adopting green hydrogen mobility in line with its long-standing dedication to environmental preservation and clean energy transition. This interaction reflects a shared vision for sustainable development, with India aiming to establish itself as a global frontrunner in green hydrogen production, while positioning Bhutan as a crucial partner in the broader regional energy transition. The collaboration reinforces both countries' resolve to promote renewable energy initiatives and contribute to a greener, low-carbon future.Hydropower is a backbone of Bhutan's economy, contributing around 63% to its total exports and strengthening India-Bhutan economic ties. India benefits by addressing its energy shortfall, while Bhutan secures revenue through power exports, making this partnership a model of regional energy cooperation.

Significance of Hydro DiplomacyThis collaboration reflects the potential of hydro diplomacy in fostering regional stability, economic development, and energy security. It serves as a model for other countries engaged in transboundary water management.

India's Energy Scenario

Economic development depends on energy services. In order to increase the efficiency of its economy, India must now balance its ambitious climate goals with its growing energy needs. India's initiatives to raise the proportion of clean energy in its installed capacity and lowering its emissions intensity is a big step in fulfilling its pledges to combat climate change and promote sustainable development. India is getting closer to reaching its 2030 NDC targets as of October 2024, having installed 203 GW of renewable energy and lowered the GDP's emission intensity by 33% (between 2005 and 2019). India's "Viksit Bharat 2047" initiative aims to make the country a developed nation by 2047. It is committed to provide clean, reliable and affordable energy to all its citizens.

In the global energy transition, India is a key player. Due to its expanding population, rising energy demands, and remarkable economic expansion, its energy journey is vital for the world as a whole, not just for itself. This illustrates India's changing standing on the international energy and climate scene, where its Achieving the global climate goals depends on the growth and trajectory of emissions. India's transition to clean energy was significantly shaped by the preceding ten years (2013-2023). India rose to become the world's third-largest producer of renewable energy and the fourth-largest consumer of electricity. Here is a look at the noteworthy advancements that have been made.

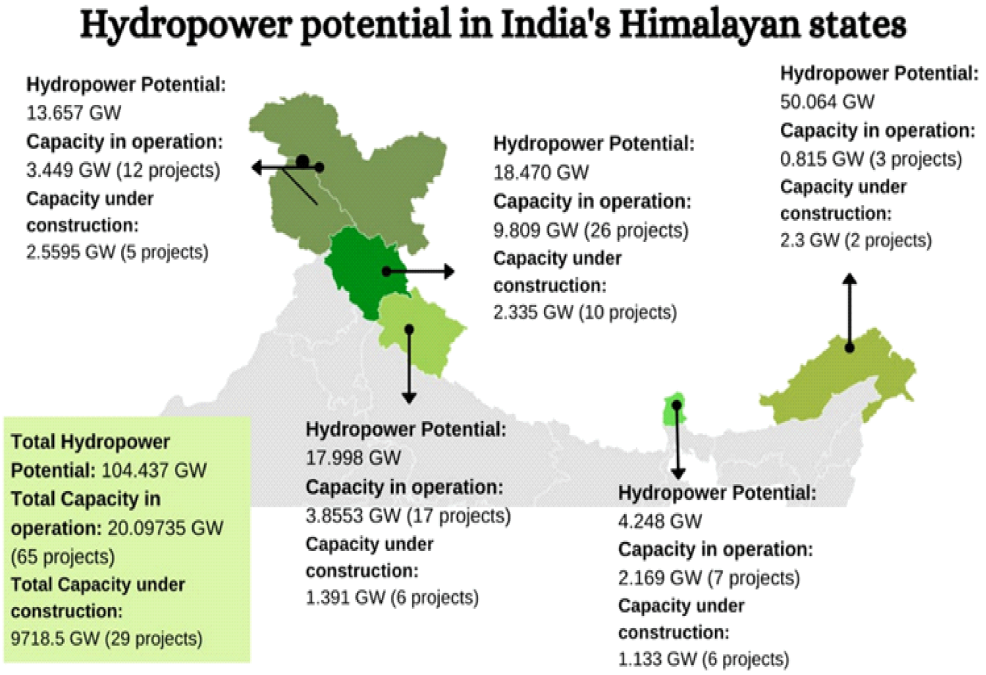

Fig- 2

India's Himalayan states hold immense hydropower potential, with a total estimated capacity of 104.437 GW, as shown in the image. However, only 20.09735 GW is currently operational across 65 projects, while 9.7185 GW is still under construction in 29 projects. The states with the highest hydropower potential include regions in the Northeast and Northern Himalayas, crucial for India's energy security Bhutan, being a landlocked country, relies on external sources to meet its basic needs and requires access to foreign markets. This necessitates the use of neighboring countries' land for trade and connectivity. Given this geographical and economic reality, Bhutan's close relationship with India was inevitable.

India has played a crucial role in Bhutan's development, particularly in its early years. During Bhutan's First Five-Year Plan, India provided significant financial assistance, with a major focus on the development of hydroelectric projects, most of which were funded by India. Additionally, under Project Dantak, India was responsible for constructing key road networks in Bhutan, enhancing connectivity and infrastructure.

Bhutan acknowledges India's contributions and values the strong bilateral ties between the two nations. The Bhutanese people also recognize the importance of this relationship, as it has played a vital role in their country's progress and economic stability. India has actively supported Bhutan's hydropower sector, recognizing that a stable and economically strong Bhutan is beneficial for regional security. Under various agree-

ments, India has financed and constructed multiple hydropower projects in Bhutan, including Tala, Chukha, Kurichhu, and Mangdechhu. These projects not only contribute to Bhutan's economic growth-since electricity exports to India form a major source of revenue-but also help meet the energy demands of India's northeastern states.

China Factor :

China has long sought to establish trade routes through Bhutan to enhance its regional connectivity and strategic influence. Over the years, China has also laid territorial claims over certain Bhutanese regions, leading to tensions between the two countries. Recognizing these challenges, India's first Prime Minister, Jawaharlal Nehru, made it clear that any attack on Bhutan would be considered an attack on India, as it would compromise the security of the Chickens' Neck (Siliguri Corridor)-a narrow strategic passage connecting India's northeastern states to the rest of the country.

India views Bhutan's security as integral to its own national security and strategic interests. The 1962 Sino-Indian War heightened Bhutan's concerns about its own security, making it cautious about Chinese intentions. However, after India's victory in the 1971 Indo-Pak war, which led to the creation of Bangladesh, Bhutan gained confidence in India's military and diplomatic strength. This reinforced Bhutan's trust in India as a reliable security partner.

Since then, Bhutan has continued to align closely with India on matters of security and foreign policy, ensuring that its sovereignty remains protected while also benefiting from India's economic and infrastructural support.

Bhutan's trade and economic dependence on India make it difficult for the country to fully support China or align with it strategically. Nearly 80% of Bhutan's trade, including both imports and exports, is with India. Additionally, India provides significant financial assistance, invests in Bhutan's infrastructure, and supports its hydropower sector, which forms the backbone of Bhutan's economy.Given this deep economic and strategic interdependence, Bhutan cannot easily shift its support toward China without risking its economic stability. While Bhutan engages in border negotiations with China and seeks to maintain diplomatic balance, aligning with China at the cost of its relationship with India would not be practical.Moreover, Bhutan does not have formal diplomatic relations with China and remains cautious due to past territorial disputes. India's role in ensuring Bhutan's security, along with their strong historical and economic ties, makes it unlikely that Bhutan would shift its stance in a way that undermines India's interests.

Buddhism and cultural ties play a significant role in shaping the strong relationship between India and Bhutan. Bhutan follows Buddhism, which shares deep historical and spiritual connections with Indian Buddhism. Many Bhutanese religious traditions, texts, and monastic practices have their origins in ancient India, particularly from Nalanda

and Bodh Gaya. This cultural and religious bond strengthens trust and goodwill between the two nations.India has supported Bhutan in preserving its unique cultural heritage while also facilitating modern development. Unlike China, whose approach to Tibet raised concerns in Bhutan regarding cultural preservation, India has always respected Bhutan's sovereignty, traditions, and Buddhist identity. This makes India a natural and preferred partner for Bhutan.

Thus, beyond economics and security, shared religious and cultural values further cement Bhutan's inclination toward maintaining a close and cooperative relationship with India rather than shifting towards China.

Conclusion

India-Bhutan hydropower diplomacy stands as a strategic pillar of their bilateral relations, intertwining economic, environmental, and geopolitical interests. Bhutan, often called the "Hydropower Capital of South Asia," has leveraged its riverine potential with India's financial and technical backing. This cooperation has not only ensured Bhutan's economic growth, with hydropower contributing nearly 30% of its GDP and 70% of its total exports, but also strengthened India's energy security and regional influence.

Unlike conventional energy trade, hydropower cooperation between India and Bhutan operates on a mutually beneficial model, where India invests in Bhutan's energy infrastructure and imports surplus electricity at pre-negotiated rates. This model enhances Bhutan's self-reliance while securing India's renewable energy needs. Additionally, India's role in building, financing, and operating Bhutan's key hydropower projects underscores a deeper strategic commitment beyond economic gains, aligning with its Neighborhood First Policy.

However, future cooperation must address environmental sustainability, climate risks, and financial dependencies. The growing impact of glacial melting and changing river flows due to climate change necessitates more resilient hydropower strategies. India and Bhutan must also explore joint investment in energy storage solutions and diversified regional grids to reduce vulnerabilities. Multilateral engagement through BIMSTEC and SAARC energy initiatives can further integrate Bhutan's hydropower into South Asia's broader energy landscape.

Thus, hydropower diplomacy between India and Bhutan is not just a tool for energy cooperation but a foundation for long-term strategic and economic partnership. By evolving their energy collaboration into a more sustainable and technologically advanced framework, both nations can reinforce their positions as leaders in green energy diplomacy in South Asia.

References:

1. Bhattacharjee, S. (2020). India-Bhutan relations: An evolving partnership. New Delhi: Observer Research Foundation.
2. Dorji, T. (2021). Bhutan's strategic importance in South Asia. Journal of Himalayan Studies, 12(1), 45-63.
3. Ganguly, S. (2020). India's foreign policy and neighborhood dynamics. New Delhi: Sage Publications.
4. Kumar, R. (2020). India's Neighbourhood First Policy and Bhutan: Challenges and prospects. South Asian Survey, 27(2), 134-150.
5. Ministry of External Affairs. (2007). India-Bhutan Friendship Treaty. Government of India.
6. Ministry of External Affairs. (2020). India's Neighbourhood First Policy: A strategic overview. Government of India.
7. Ministry of External Affairs. (2023). Bilateral relations between India and Bhutan. Government of India.
8. Pant, H. V. (2017). Doklam and India's neighborhood strategy. Strategic Analysis, 41(5), 465-470.
9. Planning Commission of Bhutan. (2021). 12th Five Year Plan document. Royal Government of Bhutan.
10. Rathore, S. (2018). Revisiting the India-Bhutan Friendship Treaty of 2007: Autonomy and partnership. International Journal of Asian Studies, 15(3), 201-217.
11. Singh, A. (2017). Bhutan's geopolitical role in the India-China-Bhutan triangle. Asian Affairs, 48(4), 572-588.
12. World Bank. (2022). Hydropower development in Bhutan: Balancing growth and sustainability. World Bank Publications.

Anshu Yadav
Research Scholar
Department of Defence and Strategic Studies
Deen Dayal Upadhyaya Gorakhpur University, Gorakhpur
Uttar Pradesh

Beyond Anthropocentrism:
An Ecocritical Study of the Select Writings of Joseph Conrad

Bapin Mallick
&
Mahamadul Hassan Dhabak

Abstract
The anthropocentric approach, originating from Protagoras, posits that humans serve as the ultimate criterion for assessing all entities. It is believed that humans are responsible for determining the existence and absence of entities in the universe. Anthropocentrism is a viewpoint that perceives value as either instrumental or non-intrinsic. It perceives nature as a reservoir of resources to be utilised and exploited for the advantage of humanity, regarded as the sole creation of God gifted with rationality. From an anthropocentric viewpoint, nature is regarded solely as a commodity for achieving human goals. Advancements in science and technology, along with the rise of materialism and consumerism, have further reinforced this anthropocentric view.It is important to note that various ancient texts specify the central position of humans in comparison to other species in the biosphere. Genesis asserts that God commands mankind to be faithful, procreate, inhabit the planet, exercise authority over it, and possess dominion over all terrestrial, aquatic, and avian life forms.According to God, He has provided every plant that produces seeds and every tree with seeds in its fruit for humans to eat (The Holy Bible 1). The present paper tries to revisit the select writings of Joseph Conrad from the perspective of ecocriticism to raise certain questions against the notion of anthropocentrism by advocating the concept of the "intrinsic value" of all forms of life. The focus will also be on how Conrad dismantles the notion of human exceptionalism through his powerful articulations by emphasising the symbiotic relationship between humans and nonhumans to address the ecological crisesof the contemporary world.
Keywords : Anthropocentrism, Ecocriticism, Intrinsic Value, Instrumental Value, Biocentrism

The Age of Enlightenment represents a pivotal epoch in human history. It functioned as a link between the contemporary day and the historical periods of humanity referred to as the classical and mediaeval epochs.However, it also brought about new difficulties

Mallick, Bapin & Dhabak, Mahamadul Hassan : Beyond Anthropocentrism : An Ecocritical Study of the Select Writings of Joseph Conrad
Open Eyes : Indian Journal of Social Science, Literature, Commerce & Allied Areas, Volume 22, No. 1, June 2025, Pages : 50-58, ISSN : 2249-4332

that the modern society is currently struggling with, one of which is the depletion of nature caused by reckless exploitation. The Age of Enlightenment valued reason as the main authority. It is widely acknowledged that humans possess the capacity for reasoning, which plays a significant role in promoting a human-centric perspective on the cosmos. This perspective has greatly contributed to the advancement and expansion of science and technology.

Joseph Conrad's works, although previously subjected to extensive critical analysis, are amenable to additional scrutiny under the emerging theoretical paradigm of ecocriticism. Ecocriticism ascribes the depreciation of nature to the marginalisation, dominance, and exploitation of the environment. Conrad's portrayal of the relationship between man and nature appears to offer a continuous criticism of the philosophyof the Enlightenmentthat devalues nature. This criticism is evident in the way Conrad initially presents and then dismantles the belief that humans are the centre of the universe. The reversal method employed leads to the conclusion that Conrad does not advocate for the notion of humans as masters of nature. Instead, he establishes, in alignment with the philosophy of ecocritics, that humans are merely minuscule components within the expansive biotic realm of nature.

Numerous critical and theoretical frameworks, such as postcolonial studies, feminist studies, gender studies, psychoanalytic studies, and narratological studies, have been employed to conduct a comprehensive analysis and examination of Conrad’s literary works. Although there have been numerous critical analyses of his writing over the years, the recently developed theory of ecocriticism emphasises the need to re-examine his works toimprove one's knowledge of the complex relationship between humans and nature that is intricately woven throughout his writings. Hence, this paper explores the select works of Conrad to dismantle the dualistic worldview of creating division between the human and the nonhuman.

Ecocriticism offers an intense and unyielding critique of anthropocentrism, a perspective that prioritises human beings above all else. This viewpoint is fundamentally grounded in classical Western philosophy and theology, culminating in the egocentric, scientific, and progressive principles of the Enlightenment.Ecocriticism is based on the idea that nature has become noticeably silent in the human-centred Western discourses established by Enlightenment thinkers like Bacon and Descartes. It seeks to explore the reasons behind nature’s passive role in modern anthropocentric culture. According to Christopher Manes, over a period of five hundred years,“Man has been the centre of conversation in the West. This fictional character has occluded the natural world, leaving it voiceless and subjectless”(26).

Bacon, a significant Enlightenment figure, evaluates nature exclusively in terms of its practical use, neglecting its intrinsic existence and conceptualising it primarily with respect to its benefits for humans. Descartes, however, views nature with disdain,

describing it as alifeless entity lacking the attributes of consciousness or spirituality. This perspective stems from his well-known philosophy of mind/body dualism, which also extends to a dualism between man and nature. According to this philosophy, man is the only being with a mind or spirit, while nature is dismissed as inanimate matter devoid of these qualities. Hence, these two prominent figures in the Enlightenment movement, who prioritise human-centered beliefs, contribute substantially in their own ways to the complete devaluation of nature. They either view nature as a mere tool for human purposes or as lifeless material intended solely for the exploitation of humans.

Ecocriticism is the interdisciplinary examination of literature and the environment, wherein several scientific fields collaborate to analyse environmental conditions and propose practical solutions to contemporary environmental challenges.In this context, it is pertinent to note that various schools of thought, such as green (cultural) studies, ecopoetics, and environmental literary critique, refer to this purposefully broad approach. Ecocritics aim to examine phenomena that possess inherent value in all forms of life. Glotfelty argues that "Ecocriticism is the study of the relationship between literature and the physical environment" (xviii). Lawrence Buell defines ecocriticism as "a study of the relationship between literature and the environment conducted in a spirit of commitment to environmentalist praxis" (20).Hence, thinkers of this domain are intrigued by the quest for a precise definition of the term "nature" and whether the exploration of "place" could be considered as a distinct category, similar to class, gender, or race. Their primary objective is to analyse the human experience of wildness with greater precision. Their main focus is on understanding how this perception has evolved throughout time. The thinkers are concerned about how contemporary environmental issues are portrayed in popular culture and literature.These thinkers consider other disciplines, such as history, philosophy, ethics, and psychology, as potential contributors to ecocriticism.

The term "ecocriticism" was first used by William Rueckert in his 1978 article "Literature and Ecology : An Experiment in Ecocriticism." His intention was to emphasise the application of ecology and ecological principles in the analysis of literature (108). Since then, individuals have written numerous works pertaining to ecotheory and critique, and this field of study continues to advance. The increase in environmentalism throughout the late 1960s and 1970s led to a surge of literary writers who contributed their works addressing environmental issues. However, there was no collective effort to examine the ecological and environmental aspects of literature. Consequently, works that focused on environmental awareness were dispersed and classified under various subjects such as pastoralism, human ecology, regionalism, and American studies.

Raymond Williams, a well-known British Marxist critic, made important contributions to literary criticism. In 1973, he released a seminal critique of pastoral writing entitled "The Country and the City." This work is widely regarded as a brilliant reflection of the

two decades of leftist scepticism towards the genre's ideological evasions and its tendency to overlook the labour of rural workers. Williams acknowledged that the losses depicted in pastoral literature could be authentic, and he expressed his support for a strong environmentalist ideology. Joseph Meeker's The Comedy of Survival (1974), which is considered an early contribution to this discipline, presented a particular interpretation of an argument that would subsequently become the prevailing perspective in the fields of ecocriticism and environmental philosophy (87). He argued that the main cause of the environmental disaster is a cultural tradition in the Western world that separates culture from nature and gives greater importance to culture. Meeker attempted to illustrate that adopting a "comic mode" for navigating challenges and prioritising love over conflict had greater ecological significance. In the subsequent phase of ecocriticism known as the "second wave," he has embraced an ecophilosophical standpoint that appears to be supported by scientific authority. He used it as a criterion for evaluating literary worth, which has had more influence than Raymond Williams's ideological and historical analysis of the changes in how a literary genre portrays nature.

It acquired popularity as a cohesive and structured movement in the United States throughout the 1990s, eventually disseminating to other areas, including India. In the mid-1980s, a transformation transpired as researchers began to collaborate to formally establish ecocriticism as a genre, aided by the Western Literature Association (WLA). The primary objective is to reassess nature-based writings and establish them as a non-fictional literary genre. Through the collaborative efforts of numerous individuals, Glotfelty became the first holder of an academic position as a professor specialising in literature and the environment. The UNR Organisation has maintained its status as the primary hub of ecocriticism since its establishment. The organisation, ASLE, has expanded significantly, attracting several members from the United States and various other places worldwide. Subsequently, numerous branches of ASLE and its affiliated organisations were established in various countries across Europe and Asia, including the UK, Japan, Korea, Australia, New Zealand (ASLEC-ANZ), India (OSLE-India), Taiwan, Canada, and Europe.

Conrad's powerful articulations reveal a deep and lasting engagement with the traditional anthropocentric tenets of Western philosophy, particularly those of the Enlightenment. A careful examination of his story would demonstrate that Conrad, despite appearing to promote the concepts of the Enlightenment that emphasise human dominance over nature, undermines this notion by satirically challenging mankind's control over the natural world. His narrative, which I refer to as Conrad's double-helix nature narrative, demonstrates how two opposing and conflicting strands are intricately woven together. This results in a narrative that is deliberately constructed and then deconstructed. The novelist appears to be making a sarcastic criticism of the anti-Nature beliefs of the

Enlightenment, which challenge the fundamental beliefs of Western anthropocentrism. This belief system is primarily based on the idea that humans have supreme authority over nature.

Conrad's masterpiece, Heart of Darkness, explores the relationship between man and nature.While the work is a continuous exploration of racial inequality, it also serves as a vivid portrayal of humanity's direct confrontation with African nature, which the coloniser perceives as a voiceless, lifeless, and dejected entity. It is worth noting Marlow's immediate and instinctive reactions upon seeing the immense forest :

> The smell of mud, of primaeval mud, by Jove ! was in my nostrils, the high stillness of primeval forest was before my eyes…All this was great, expectant, mute… Could we handle that dumb thing, or would it handle us ? I felt how big, how confoundedly big, was that thing that couldn't talk, and perhaps was deaf as well (30).

It is pertinent to note that the text foregrounds a contrasting scenario compared to the earlier portrayal of humans as dominant and self-centred. This alternative narrative, previously mentioned, reveals a different perspective on the relationship between humans and nature. In this narrative, the attempt to control nature is met with harsh mockery and cynicism. The profound belief held by Kurtz in his final hours provides strong evidence of a significant change in his perspective :

> You should have heard him say, 'My ivory.' Oh yes, I heard him. 'My Intended, my ivory, my station, my river, my-'everything belonged to him. It made me hold my breath in expectation of hearing the wilderness burst into a prodigious peal of laughter that would shake the fixed stars in their places. Everything belonged to him-but that was a trifle. The thing was to know what he belonged to, how many powers of darkness claimed him for their own. (58)

This part illustrates Kurtz's illusory sense of dominion over nature by juxtaposing his self-declared ownership with his true servitude. It debunks his futile claims of mastery and presents a satirical portrayal of his supposed genius, evoking a complex blend of pity and ridicule towards him. Furthermore, this contradicts the Baconian ideas of controlling and owning nature. The defeat and capitulation of Kurtz strongly indicate nature's resistance to humans, which can be considered a significant blow to the Enlightenment's belief in human autonomy and power over nature. As Ian Watt observes, Kurtz's defeat "enacts one of the ideological lessons of Heart of Darkness : that nothing is more dangerous than man's delusions of autonomy and omnipotence" (44).

Another notable instance of Conrad's anti-anthropocentric intent is his striking depiction of humanity's decline in the face of Nature's pervasive visual presence.Marlow, amidst vast clusters of trees during his trek across the River Congo, expresses his feelings of insignificance and disorientation :

> Trees, trees, millions of trees, massive, immense, running up high; and at their foot, hugging the bank against the stream, crept the little begrimed steamboat like a sluggish beetle crawling on the floor of a lofty portico. It made you feel very small, very lost, and yet it was not altogether depressing, that feeling (40-41).

The concluding sentence of the quote indicates that the coloniser openly recognises a sense of insignificance and disorientation when confronted with the vast, cosmic ecosystem of gigantic nature. In the introduction of his book Deep Ecology, eco-philosopher Michael Tobias astutely notes that humanity holds a remarkably trivial position within the expansive biosphere of nature.Tobias' depiction of the minuteness of humanity in the face of the immense scale of nature is captivating : "From the biosphere's perspective, the whole point of Homo sapiens is their armpits, aswarm with 24.1 billion bacteria" (vii).

Conrad's abrupt and vivid depictions of confessional states in his protagonists and characters distinctly illustrate his narrative that repudiates the concept of human exceptionalism. Marlow's unwavering acknowledgement of humanity's insignificance in the face of nature's all-encompassing immensity starkly contrasts with the arrogant, patronising, and dissatisfied attitudes of the other characters in Conrad's work.By portraying his characters as making self-defeating assertions, the author appears to be emphasising his intended theme, implicitly criticisingthe notion of anthropocentrism.

Conrad's Nostromo exhibits a clear pattern of oscillating between the portrayal of human-centredperspectives and their eventual deconstruction. The narrative initially examines the perception of Nature, namely the Sulaco Valley, by colonial individuals as a mere commodity to be possessed and exploited by capitalist Westerners.The cold and detached mechanistic approach of Sir John and the engineer-in-chief, who arrived to assess the Sulaco Valley for future capitalist ventures, is evident.Initially, the stunning natural beauty of the Sulaco Valley greatly impresses Sir John and the engineer-in-chief. However, this spontaneous delight is short-lived and quickly overshadowed by "all the indifference of a man of affairs to Nature" (Nostromo 39).In addition, the narrator views the soil of Costaguana as a mere "bottomless pit" subjected to European investments and foreign incursions, which exemplifies the common tendency of capitalism to turn everything into commodities. He boasts : "Now, what is Costaguana ? It is the bottomless pit of 10 percent loans and other fool investments. European capital had been flung into it with both hands for years" (76-77). It is, of course, redolent of the idiosyncratic human way of seeing nature as an object meant for human exploitation in a way, as the Enlightenment philosopher Descartes would assert, that men "render ... [themselves] as the lords and possessors of nature" (78).When European economic endeavours perceive nature as a silent object for forceful exploitation, the degradation of nature reaches its abhorrent depths. The speaker provides a detailed account of "[thecoloniser], with each

day's journey, seemed to come nearer to the soul of the land in the tremendous disclosure of this interior ..., a great land of plain and mountain ..., suffering and mute, waiting for the future in a pathetic immobility of patience" (88).

The individual perceives Nostromo as a heroic figure and admires his intrepid disposition, yet they also see the triviality and fragility of humans in the presence of nature's power.This understanding arises from their personal recognition of their incapacity to confront such forces. The speaker provides a detailed account in the following manner :

> In this Dr. Monygham was sincere. He esteemed highly the intrepidity of that man [Nostromo], whom he valued but little, being disillusioned as to mankind in general, because of the particular instance in which his own manhood had failed. Having had to encounter single-handed during his period of eclipse many physical dangers, he was well aware of the most dangerous element common to them all : of the crushing, paralysing sense of human littleness, which is what really defeats a man struggling with natural forces, alone far from the eyes of his fellows. (433)

The narrator illustrates how nature exerts authority over the personality, intellect, and spirit of individuals, subverting the notion of human supremacy.The author states :

> It [Nature] takes possession of the mind, ... Decoud caught himself entertaining a doubt of his own individuality. It had merged into the world of cloud and water, of natural forces and forms of nature. In our activity alone do we find the sustaining illusion of an independent existence as against the whole scheme of things of which we form a helpless part. (497).

Moreover, Martin Decoud's self-perception as diminished to a subordinate role in connection to Nature significantly contests the notion of the master-slave dynamic between people and Nature. The narrator describes the protagonist's final submission to Nature as he sits down on the soft earth, appearing resigned and helpless, as if he were bound to the treasure. He sits with his legs drawn up and clasped in his hands, resembling a defeated slave placed on the ground. In his letter to his friend R. B. Cunninghame Graham, Conrad discusses the concept of man's eternal subordination to nature and defines man as a self-conscious slave of nature, rather than its master. In his writing, he articulates the notion that humanity's tragedy does not stem from our submission to natural forces but rather from our awareness of this fact. Being a member of the animal kingdom on this planet is justified, but once you become aware of your enslavement, the suffering, resentment, and conflict-the tragedy commences. Conrad's sincere acknowledgement of this immensity can be interpreted as an implicit and unconscious rejection of Bacon's metaphor that suggests humans have complete control over nature.

It is significant to note that Conrad simultaneously portrays and assesses Western anthropocentrism in his colonial works. In his book Conrad and Impressionism, John

G. Peters critically recognises the novelist's refusal to prioritise human beings as the centre of the universe, which is an essential aspect of Western humanism. Peters makes a compelling observation: "... western civilization in particular comes under Conrad's scrutiny, and since the popular view of western civilization at the time conceived it to be based upon an absolute foundation [of anthropocentrism], Conrad's epistemology strikes directly at the foundation" (5). Consequently, Conrad ultimately accomplishes what Dominic Head refers to as "the removal of privilege from the human subject" and, simultaneously, the disappointment of the human being's self-proclaimed superiority over nature. Furthermore, he promotes a worldview that opposes the Enlightenment and anthropocentrism, thereby supporting his assertion that nature is independent and all-powerful, while humans are insignificant in comparison to its pervasive vastness (5).

Joseph Conrad's literary worksunveil a critique of anthropocentrism and the colonial exploitation of both land and individuals. His writings, which are selected for our study,deconstruct the notion of human supremacy by depicting nature as an active, frequently overpowering force that challenges human dominion and colonial rationale. His portrayal of the forest as inscrutable and inaccessible challenges Enlightenment ideals of control and reason, presenting the non-human world as a domain with intrinsic agency. His narratives embody the apprehensions of imperial expansion while alluding to a profound, nearly prophetic comprehension of ecological interdependence. Consequently, Conrad's writings, influenced by the ideologies of his era, present a rich foundation for ecocritical analysis and exemplify early literary efforts to undermine anthropocentrism, a notion that has become increasingly pertinent in our contemporary world.

Works Cited

Buell, Lawrence. The Environmental Imagination : Thoreau, Nature Writing, and the Formation of American Culture. Harvard University Press, 1996.

Conrad, Joseph. Heart of Darkness. Orient Longman, 1992.

---. Nostromo : A Tale. Dent, 1972.

Glotfelty, Cheryll, and Harold Fromm, editors. The Ecocriticism Reader : Landmarks in Literary Ecology. Univ. of Georgia Press, 2009.

Manes, Christopher. "Nature and Silence." The Ecocriticism Reader : Landmarks in Literary Ecology, edited by Cheryll Glotfelty and Harold Fromm, Univ. of Georgia Press, 2009, pp. 15-29.

Meeker, Joseph W. The Comedy of Survival. University of Arizona Press, 1997.

Peters, John G. Conrad and Impressionism. Cambridge University Press, 2001.

Rueckert, William. "Literature and Ecology : An Experiment in Ecocriticism." The Ecocriticism Reader: Landmarks in Literary Ecology, edited by Cheryll Glotfelty

and Harold Fromm, Univ. of Georgia Press, 2009.
The Holy Bible. Thomas Nelson and Sons Ltd., 1957.

Bapin Mallick
Assistant Professor, Department of English
Dr. B.R. Ambedkar College, West Bengal

Mahamadul Hassan Dhabak
Assistant Professor in English
Department of Basic Sciences & Humanities,
B V Raju Institute of Technology,
Narsapur, Medak, Telangana.

Cross-Border Activities : A Case Study on Security of West Bengal

Dipika Lama

Abstract

The India-Bangladesh border is highly porous, leading to controversy over illegal migration, trafficking, smuggling, and cross-border terrorism, all of which threaten national security and social stability. This case study examines the security dynamics of cross-border activities along the Gede border in Nadia district, West Bengal.

Keywords : India- Bangladesh border, Cross-Border activities, Gede border.

Introduction

West Bengal shares a 2,216 km long land border with Bangladesh, making it the longest international border between the two nations. A significant portion of the India-Bangladesh border on the West Bengal side remains unfenced, leading to serious vulnerabilities in both surveillance and security. Traditionally, borders have mainly served to prevent threats such as illegal migration, trafficking of drugs and narcotics, contraband, smuggling, and cross-border terrorism that threaten national security. The India-Bangladesh border has long been a source of controversy, particularly concerning cattle smuggling, gold smuggling, drug trade, and human trafficking, which are considered major contributors to illicit trade and crime (Raina, 2024:5). The present study aims to highlight cross-border activities along the Gede border in Nadia district, West Bengal. It also offers insights into the roles played by government and non-government actors in preventing illegal activities along these borders.

Geographical factors also significantly influence a country's economy. Likewise, residents in border areas often face economic disadvantages. The lack of economic opportunities and infrastructural development in these regions has led to an increasein unlawful activities. Most inhabitants in border zones are engaged in smuggling and other criminal activities (Das, 2021:28). Consequently, such activities provide a vital source of income to meet their needs.

Geographical Implications of the Gede Border

The Gede border, situated in Nadia district of West Bengal, is one of the most well-known and strategic land crossings between India and Bangladesh. Gede is the last village on

Lama, Dipika : Cross-Border Activities : A Case Study on Security of West Bengal
Open Eyes : Indian Journal of Social Science, Literature, Commerce & Allied Areas, Volume 22, No. 1, June 2025, Pages : 59-63, ISSN : 2249-4332

the West Bengal side, directly opposite Darshana, a small town in Chuadanga district, Bangladesh. It is accessible via rail and road. Being a border village, Gede is heavily monitored by the Border Security Force (BSF). Despite heightened security measures, illegal activities persist, and Nadia district hosts a substantial number of Bangladeshi migrants who entered through Gede. The Cooper's Camp, under Ranaghat subdivision, is the largest refugee camp in Nadia district (Nandy, 2019:125). The region's primary economic pursuits are agriculture and trade. While legal trade occurs, reports of smuggling, drug trafficking, and contraband items also surface. To support this, I consulted online newspapers for various illegal activities reported in the area. In 2019, the Directorate of Revenue Intelligence (DRI) seized 100 gold biscuits worth Rs 3.77 crores from Majhdia Railway station near the Indo-Bangladesh border. The gold was smuggled from Bangladesh into India. To combat cross-border activities, the DRI introduced an innovative reward system, offering informers up to Rs 1.5 lakhs per kilogram based on the gold seized and the credibility of the tip. Cattle smuggling also occurs along the India-Bangladesh border, particularly during the monsoon or festival seasons when cattle demand rises. The BSF is fully prepared to prevent such activities, deploying night vision devices, speedboats, and non-lethal weapons.

In 2024, the BSF confiscated a gold smuggling racket involving women carrying 7 kg of gold worth Rs 4.70 crores from Bangladesh to India through Gede. Often, the main smugglers avoid direct involvement, recruiting impoverished individuals for monetary gain. To curb this menace, the BSF launched the Seema Sathi Helpline, allowing citizens to share information about gold smuggling via WhatsApp or voice messages, with rewards for the informers. In another incident, BSF seized Bangladeshi currency worth Rs 21 lakh and drugs in Nadia district of West Bengal.

Due to security threats and law-and-order challenges in the region, effective border management is crucial for national security. To combat crime, the BSF has installed beehives designed to deter smugglers from suspicious activities. Under the central government's Vibrant Village Programme, over 3,000 medicinal plant saplings were distributed to Gede residents in 2023 to aid bees in pollination.

Common Smuggling goods between the India and Bangladesh border and vice versa are as follows :

From India to Bangladesh	From Bangladesh to India
Cattle	Cotton and clothing
Narcotics, Phensedyl and Drugs	Fish
Cosmetics	Fertilizer
Weapons, ammunition, and explosives	Fuel and edible oil
Clothing items	Brass, Touchstone
Low-quality medicine	Electronics and computer parts
Low-quality motor parts	Gold bar
Yaba tablets	

SOURCE: Rahman & Islam, 2024

Review of Literature

Ghosh (2011), in her article 'Cross-border activities in everyday life : the Bengal borderland,' examines cross-border exchanges along the Bengal border despite increased control and militarizationby the Indian government over the past decade. Her ethnographic study in the anonymous Prantapur village reveals how different interest groups perceive, portray, and negotiate the borderland's social and political landscape and discusses the cross-border activities taking place in the region.

Pattanaik (2011), in her article entitled 'India-Bangladesh Land Border : A Flawed Inheritance and a Problematic Future,' points out different border-relatedproblems between India and Bangladesh and states some of them as a colonial inheritance. She discusses issues like enclave settlement, char lands, illegal immigration, and border economy, particularly smuggling, considering border fencing as a potential solution.

Anant (2019) in his article 'Indo-Bangladesh Border Security Issues : In Context of Land Boundary Disputes between India and Bangladesh' reflects upon the causes of border disputes. He highlights border disputes as serious challenges to India's national security before and after Bangladesh's independence.

Nandy (2019) inthe titled 'Socio-political and security perspectives of Illegal Bangladeshi migrants in West Bengal,' explores illegal migration's socio-economic and legal aspects, noting variations across some districts namely North 24 Parganas, Nadia, Murshidabad and Cooch Behar of West Bengal and its impact on the India-Bangladesh relationships. He discusses the socio-economic and legal characteristics of this illegal migration andits influence on elections in the Indian State of West Bengal.

Rahman & Islam (2024) in their article 'Bangladesh-India Border Conflict : Challenges and Opportunities' highlighted the problems in the Bangladesh-India border areas. They talk border conflicts, including border killings, fencing, enclaves, illegal border crossings

and trades. They propose recommendations to resolve the border conflicts between India and Bangladesh.

Atiquazamman (2025) in his article 'Culture and Identity of People Living in the Indo Bangla Borderlands' explores how borders influence culture and identity, emphasising shared needs and expressions among border inhabitants, and advocates for regular bilateral meetings, surveillance technology, and development programmes to foster peace and security.

Recommendations

Regular meetingsand border negotiations between the Border Security Force (BSF) and Border Guard Bangladesh (BGB) must be held to prevent illegal activities along the borders of these two countries.

The government must focus on the installation of border surveillance technology such as CCTVs, night vision devices, and drones along the sensitive areas

Border Area Development Programme (BADP), which is a central government initiative, must focus on the overall development of border villages. They must focus on improving schools, roads, and livelihoods to reduce criminal activities.

Non-governmental organizations must play an important role in creating awareness among villagers regarding human trafficking and other forms of criminal activities.

Conclusion

West Bengal's borders remain a major concern due to porous terrain and proximity to trade routes, which facilitate cross-border activities, posing security challenges. A collaborative effort among government agencies, NGOs, and local communities is essential to reduce crime and enhance regional security.

References

- Anant, Kumar (2019). Indo-Bangladesh Border Security Issues: In Context of Land Boundary Disputes between India and Bangladesh. IRJMSH. Vol.10, Issue. 4.
- Atiquazamman, Sharif (2025). Culture and Identity of People Living in the Indo Bangla Borderlands. Literary Studies. Vol. 38.
- Das, Pushpita (2021). India's Approach to Border Management: From Barriers to Bridges.KW Publishers Pvt. Ltd.p.28.
- Ghosh, Sahana (2011). Cross-border activities in everyday life: the Bengal borderland. Contemporary South Asia. Vol. 19, No. 1.

- Nandy, Debasish (2019).Socio-political and security perspectives of Illegal Bangladeshi migrants in West Bengal: the impact on Indo-Bangladesh relations.Journal of Historical Archaeology & Anthropological Sciences. Vol. 4, Issue 3.p.125.
- Pattanaik, S. Smruti (2011). India-Bangladesh Land Border: A Flawed Inheritance and a Problematic Future. Strategic Analysis. Vol. 35, No. 5.
- Rahaman&Islam (2024). Bangladesh-India Border Conflict: Challenges and Opportunities. Interdisciplinary Journal of Management and Social Sciences. Vol. 5, No. 1.p. 95.
- Raina, V. K. R. (2024). Illicit trade on the India-Bangladesh border. Kautilya School of Public Policy.p.5.

Website References

- (https://dri.nic.in accessed on 12th June 2025)
- (https://www.ptinews.com accessed on 10th June 2025)
- (neindiabroadcast.com accessed on 10th June 2025).
- (https://www.telegraphindia.com retrieved on 13th June 2025)

Dipika Lama
Assistant Professor
Department of Defence Studies
Sudhiranjan Lahiri Mahavidyalaya
Majdia, Nadia

Relevance of Econometric Applications for Information Managers

Ranjan Karmakar

Abstract:
Econometric applications have become an integral part of training in modern economics, information and business management. Modern information managers in number of sectors are increasingly incorporating econometric applications into their businesses to establish healthy economic strategies, to develop insight, create value, optimised solutions, and outperform competition. Econometric applications provide organisations with a potent set of tools to unlock the power of information and in effective decision making. However, econometric models and methods are applied in the daily practice of virtually all disciplines in information, business and economics like: finance, marketing, micro-economics, and macroeconomics, etc. The present paper focuses on emphasising the manner in which econometric applications can serve the development of business, and enhance performance of a firm by helping it go ahead of its competitors in this globalised world.

Keywords: Relevance of Econometrics, Econometric Applications, Econometric Methods, Applications of Econometrics, Information Managers.

1. Introduction

"Econometrics is about how we can use theory and data from economics, business, and the social sciences, along with tools from statistics, to answer "how much" questions" (Hill, Griffiths & Lim, 2011). The continuous increasing competition, exposure to global markets, increasing costs, and declining profit margins, etc. are making modern business far more challenging than it ever was. In these circumstances, econometric applications and quantitative modeling are being used by information managers in firms as a powerful means of beating the competition. Econometric applications provide organisations with a potent set of tools to unlock the power of information and in effective decision making. The empirical studies in the area of econometrics are mainly associated with mainstream research, but we have chosen to introduce the present discussion on the relevance of econometric applications with reference to information managers, because number of questions arises in the minds of modern information managers that:

- How would the sale of a company's product change during booms and recessions ?
- What exactly the role played by past sales in determining the future sales ?

Karmakar, Ranjan : Relevance of Econometric Applications for Information Managers
Open Eyes : Indian Journal of Social Science, Literature, Commerce & Allied Areas, Volume 22, No. 1, June 2025, Pages : 64-73, ISSN : 2249-4332

- How exactly do the mathematical forecasting tools predict the future sales ?
- How would an information manager infer the monthly and seasonal fluctuations in sales ?
- How would an information manager decide on the rate of growth of the company in a booming trajectory ?
- What kind of tools are required for the financial sectors ?, etc.

Answers to the aforementioned questions require good understanding of econometric techniques and applications. Information managers of the business world are often asked to make qualitative and quantitative inference from various types of data such as primary, secondary, cross section, panel, etc. A successful business strategy would come when there is the basic understanding of the objective prediction coming out of the data. In the modern business world, it is becoming of more and more significance to use the state of the art econometric model to analyse data. These highly powerful models essentially supplement one with the subjective knowledge of the domain.

2. Econometric Applications

Econometrics applications involve the formulation of mathematical / statistical models to represent real-world economic systems, whether the whole economy, or an industry, or an individual business. Econometric modeling is used to analyse complex market trends (the demand function) to determine the variables driving the growth or shrinkage of demand for a product or service. Econometric models are used to decipher the economic forces that affect supply and costs (the supply function) within an industry or firm. Few companies really understand the external forces that drive their industries, their companies, or their brands. Understanding these forces provides the foundation for strategy development and business planning.

Information managers use economic indicators as tools in the decision-making process. Economic indicators include the Gross Domestic Product (GDP), inflation rate, exports / imports, unemployment rate, personal income data, etc. Business strategists use these numbers to make decisions, such as increasing purchasing orders, issuing layoffs or increasing / decreasing production, etc. For instance, if a business analyses that fewer jobs were added to the economy during a particular period of time, it may be less likely to hire candidates with the belief that fewer people have money to spend on its products. On the other hand, an increase in the sale of durable consumer goods, such as cars, might compel a firm to increase its production if it is in a closely-related industry, such as steel. Thus, economic indicators are a useful tool though they can create a self-fulfilling prophecy.

To understand clearly the role of econometrics for information managers, it may be useful to first describe the general process of modern econometric research. Like most

other sciences, the general methodology of modern economic / econometric research can be briefly summarised in four steps (Table 1).

Table 1: Steps in Econometric Research

Steps	Summary
Step 1: Data and summary of empirical stylized facts	The stylised facts are often summarised from observed data. For instance, in microeconomics, a well-known stylised fact is the Engel's Curve, which characterises that the share of a consumer's expenditure on a commodity out of total income will eventually decline as the income increases; in macroeconomics, a well-known stylised fact is the Phillips Curve, which characterises a negative correlation between the inflation rate and the unemployment rate in an aggregate economy; and in finance, a well-known stylised fact about financial markets is volatility clustering, that is, a high volatility today tends to be followed by another high volatility tomorrow and vice versa. The empirical stylised facts often serve as a starting point for managerial econometric research. For example, the development of unit root and cointegration econometrics was mainly motivated by the empirical study of Nelson and Plossor (1982) who found that most macroeconomic time series are unit root processes.
Step 2: Development of models	With the empirical stylised facts in mind, information managers can develop a model in order to explain them. This usually calls for specifying a mathematical model of economic theory. In fact, the objective of economic modelling is not merely to explain the stylised facts, but to understand the mechanism governing the economy and to forecast the future evolution of the economy.
Step 3: Empirical verification	Economic theory only suggests a qualitative economic relationship. It does not offer any concrete functional form. In the process of transforming a mathematical model into a testable empirical econometric model, one often has to assume some functional form, up to some unknown model parameters. One need to estimate unknown model parameters based on the observed data, and check whether the econometric model is adequate. An adequate model should be at least consistent with the empirical stylized facts.

Steps	Summary
Step 4: Applications	After an econometric model passes the empirical evaluation, it can then be used to test hypotheses, to forecast future evolution of the economy, and to make policy decisions.

Source: Gujarati (2006).

3. Econometric Methods and Applications in Business

Nowadays, applied work in business requires a solid understanding of econometric methods to support decision-making. Combining a solid exposition of econometric methods (statistics, simple and multiple regression, non-linear regression, maximum likelihood, and generalized method of moments) with an application-oriented approach provides managers to enhance the performance of a firm and help to stay ahead of its competitors. The applications of econometrics of choice (logit and probit, multinomial and ordered choice, truncated and censored data, and duration data) and the econometrics of time series (univariate time series, trends, volatility, vector autoregressions, panel data, and simultaneous equations) show how econometrics can solve practical questions in modern business and management. Various econometric methods and their implications have been shown in Table 2.

Table 2: Applications of Econometrics

Applications	What it does ?
Generalised Linear Modelling (GLM)	Determination of independent drivers, degree of causality and preparation of forecasts with cross section data.
Segmentation and Clustering Analysis (SCA)	Identification of homogenous customer and product groups for strategic marketing and pricing initiatives.
Time Series Modelling (TSM)	Preparation of forecasts by building various time series models with a variety of distributional assumptions.
Constrained Optimisation (CO)	Creation of business rules by accounting for dynamic business constraints for an effective solution.

Applications	What it does ?
Generalised Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (GARCH)	Identification of independent drivers, direction and degree of causality for parameter estimation in volatile environments.
Neural Network Techniques (NNT)	Development of machine learning based estimation techniques to help in pattern identification, sequence recognition and knowledge discovery in databases.
Game Theoretic Applications (GTA)	Identification of dominant and next-best strategies in a dynamic business environment with realistic a symmetric information assumptions.
Non Linear Modelling (NLM)	Key parameters estimations requiring high degree of precision.
Response Modelling (RM)	Estimation of response probabilities to key marketing, pricing and operation strategies.

The ultimate application of econometrics in management is the creation of a comprehensive model of a market, an industry, or a company, so that the interaction of all economic indicators can be understood and predicted. For instance, an example from managing an Information Technology (IT) firm; many IT firms managers (being of a technical background) inherently focus on the product by nature and have less interest in other social sciences and econometric analysis. In such a case and IT firm would carry the risk of failing to relate to the reality of economic issues such as demand, competition, client, markets and its dynamics all of this would fill through its business model and the decision making process.

Economics is a decision science. An information manager is always making decisions. The available literature on the subject highlights that not only that information manager will have to be very well informed about the macroeconomics, and the economic environment of his or her firm, but the basics of supply chain management (that's economy-driven), the most advanced economics field nowadays (applied econometrics, games theory for negotiation, neuroeconomics for marketing), and of course, finances.

4. Ten Practical Applications of Econometrics

Information managers apply econometric tools in a variety of specific fields (such as labor economics, development economics, health economics, and finance) to shed light

on theoretical questions. They also use these tools to inform public policy debates, make business decisions, and forecast future events. Following is a list of ten interesting, practical applications of econometric techniques has been shown in Table 3.

Table 3: Ten Practical Applications of Econometrics

Applications	What it does?
1. Forecasting macroeconomic indicators:	Some macroeconomists are concerned with the expected effects of monetary and fiscal policy on the aggregate performance of the economy. Time-series models can be used to make predictions about these economic indicators.
2. Estimating the impact of immigration on native workers:	Immigration increases the supply of workers, so standard economic theory predicts that equilibrium wages will decrease for all workers. However, since immigration can also have positive demand effects, econometric estimates are necessary to determine the net impact of immigration in the labor market.
3. Identifying the factors that affect a firm's entry and exit into a market:	The microeconomic field of industrial organization, among many issues of interest, is concerned with firm concentration and market power. Theory suggests that many factors, including existing profit levels, fixed costs associated with entry / exit, and government regulations can influence market structure. Econometric estimation helps determine which factors are the most important for firm entry and exit.
4. Determining the influence of minimum-wage laws on employment levels:	The minimum wage is an example of a price floor, so higher minimum wages are supposed to create a surplus of labor (higher levels of unemployment). However, the impact of price floors like the minimum wage depends on the shapes of the demand and supply curves. Therefore, labor economists use econometric techniques to estimate the actual effect of such policies.

Applications	What it does?
5. Finding the relationship between management techniques and worker productivity:	The use of high-performance work practices (such as worker autonomy, flexible work schedules, and other policies designed to keep workers happy) has become more popular among managers. At some point, however, the cost of implementing these policies can exceed the productivity benefits. Econometric models can be used to determine which policies lead to the highest returns and improve managerial efficiency.
6. Measuring the association between insurance coverage and individual health outcomes:	One of the arguments for increasing the availability (and affordability) of medical insurance coverage is that it should improve health outcomes and reduce overall medical expenditures. Health economists may use econometric models with aggregate data (from countries) on medical coverage rates and health outcomes or use individual-level data with qualitative measures of insurance coverage and health status.
7. Deriving the effect of dividend announcements on stock market prices and investor behavior:	Dividends represent the distribution of company profits to its shareholders. Sometimes the announcement of a dividend payment can be viewed as good news when shareholders seek investment income, but sometimes they can be viewed as bad news when shareholders prefer reinvestment of firm profits through retained earnings. The net effect of dividend announcements can be estimated using econometric models and data of investor behavior.
8. Predicting revenue increases in response to a marketing campaign:	The field of marketing has become increasingly dependent on empirical methods. A marketing or sales manager may want to determine the relationship between marketing efforts and sales. How much additional revenue is generated from an additional dollar spent on advertising? Which type of advertising (radio, TV, newspaper, and so on)

Applications	What it does?
	yields the largest impact on sales? These types of questions can be addressed with econometric techniques.
9. Calculating the impact of a firm's tax credits on R & D expenditure:	Tax credits for research and development (R & D) are designed to provide an incentive for firms to engage in activities related to product innovation and quality improvement. Econometric estimates can be used to determine how changes in the tax credits influence R & D expenditure and how distributional effects may produce tax-credit effects that vary by firm size.
10. Estimating the impact of cap-and-trade policies on pollution levels:	Environmental economists have discovered that combining legal limits on emissions with the creation of a market that allows firms to purchase the "right to pollute" can reduce overall pollution levels. Econometric models can be used to determine the most efficient combination of state regulations, pollution permits, and taxes to improve environmental conditions and minimize the impact on firms.

Source: Pedace (n.d.).

5. Advantages from Econometrics

Bennion (1961) averred that there are at least two highly valuable contributions that an econometric model can make too many business decisions; and, in one sense, these contributions are virtually inseparable. First, the user gains a qualitative-quantitative insight that an information manager is unlikely to be able to get from any other method. In order to derive a predicted set of numbers from the econometric model, first it is necessary to specify clearly the full set of variables to be included in the equations constituting the model. Whatever set of predicted numbers the model yields are surely a powerful asset in the intelligent use of any decision-making process.

The second contribution of an econometric model is closely related to the first one. There are some times when the econometrician will have much greater confidence in the predicted set of numbers than at other times. Usually on those occasions when his confidence is low, he will be able to pinpoint the reasons (i.e., the areas in his model)

for his low confidence. It is then a simple matter to substitute alternative assumptions-about assumed values for autonomous variables. It is obvious that any other known means of prediction can begin to compete successfully with an econometric model as a basis for testing assumptions and for evaluating the sensitivity of one's results to alterations in those assumptions.

6. Learning from Each Other

What econometrics can learn from management is the problem solving attitude. What management can learn from econometrics is in particular its accumulated experience in the area of economic relationships as well as the imagination displayed in deriving them. Needless to say, these are broad statements which need appropriate qualifications. But apart from such qualifications, which to some extent deal with priorities and are therefore not really important, the main thing is simply that they can learn from each other, the main reason being that they have so much in common. Essentially, they have two common features. One is the object of investigation, which is usually a problem in economics-either microeconomics or macroeconomics. The other is the tool of analysis, which is statistical / mathematical to a large extent.

7. Final Observations

Making good decisions has always been the "ne plus ultra" (the highest point capable of being attained) function of top information managers. To fortify this function with the best available econometric techniques is not to weaken its foundations but to give them the greatest possible strength. The above discussion clearly shows that econometric applications can be increasingly used in management in general and by information managers in particular. The advanced econometric techniques are indeed providing the intended benefits. With databases getting more extensive and reliable, and new techniques and technology becoming available, this game has just begun. Clearly, those information managers are early movers in this arena will discover new ways of outperforming their competitors and enhancing their competitive position. Undoubtedly their existing strategic intent and objectives will drive the initial set of applications. It is possible that over time, firms will identify Blue Ocean areas, using econometric applications in their businesses, which could potentially lead to new business models or sources of competitive advantage.

References

Bennion, Edward G. (1961). Econometrics for management. *Harvard Business Review*, 39(2), 100-112.

Gujarati, Damodar N. (2006). *Essentials of econometrics* (3rd ed.). Boston: McGraw-Hill.

Hill, R. Carter., & Griffiths, William E., & Lim, Guay C. (2011). *Principles of econometrics* (4th ed.). United States of America, India: John Wiley & Sons, Inc., ISBN : 978-0-470-62673-3 (hardback).

Ichniowski, Casey., & Shaw, Kathryn L. (2009). Insider econometrics: empirical studies of how management matters. *NBER Working Paper Series 15618*, National Bureau of Economic Research, USA.

Kapoor, Harsha. (2007). Advanced analytics powering Indian business. *BSENSEX*, October-November, pp. 31-32.

Nelson, C. R., & Plosser, C. I. (1982). Trends and random walks in macroeconomic time series: some evidence and implications. *Journal of Monetary Economics*, 10(1), 139-162.

Pedace, Roberto. (n.d.). *Ten practical applications of econometrics*. Retrieved from https://www.dummies.com/education/economics/econometrics/ten-practical-applications-of-econometrics/.

Thiel, H. (1965). Econometrics and management science: their overlap and interaction. *Management Science*, 11(8), 200-212.

Ranjan Karmakar
Librarian,
Department of Central Library,
Chakdaha College,
Chakdaha, Nadia, West Bengal, India.

ISSN: 2249-4332

Journal Guidelines

Submission of Manuscript

All papers must be submitted to journalopeneyes@gmail.com

The corresponding author will get a reply in a return mail. After an initial evaluation, the paper will be sent out for external peer review. While Open Eyes aims to notify authors of acceptance, rejection, or need for revision within three months of submission, the high volume of submissions and demands on referees may not always permit attaining this target evaluation and peer review timeline. Nevertheless, Open Eyes aims to have manuscripts reviewed within six months.

Ethical Responsibilities of Authors

This journal is committed to upholding the integrity of the scientific record. The journal will follow the **COPE** guidelines on how to deal with potential acts of misconduct. Articles submitted for publication must be original, not published previously, and not being considered for publication elsewhere.

No requirement of publication fee

Open Eyes does not require payment from authors to publish their papers in the journal. All submissions undergo the same rigorous process of evaluation and peer review.

Scope of Publication

Open Eyes publishes papers related to the areas of Social Sciences, Commerce and Humanities

Open Eyes Style Guide (For details consult the website)

Submission Format

Articles must be in Bengal or in English (British) with the content arranged as follows :

The first page of the article should contain title of the article; author's complete name, affiliation, and address (omit social titles). Also include an abstract (maximum of 300 words) and Keywords.

The main text will not carry the name of the author and will constitute separate word file. For references use MLA style (8th ed.) (Author-date format).

The length of each article must not exceed 6,000 words. References should be limited to literature cited only in the main text. The manuscript must be submitted as an MS Word file, font size 12, typed 1.5 spaces on A4 paper setting.

Tables, Figures

Each table and figure (accompanied by the original tabulated data) must be on a separate sheet of paper, numbered in order, and placed at the end of the article. To facilitate layout and typesetting, the editable files of the tables and figures will be required when a paper is accepted for publication.

Text for tables should not be smaller than 9 points. Scanned or digital photos should be of high resolution (minimum of 300 dpi).

OPEN EYES

Indian Journal of Social Science, Literature, Commerce & Allied Areas

Volume 22, No. 1, June 2025

Published by :
S.R.L. Mahavidyalaya, Majdia, Nadia, West Bengal, India.
Printed by :

Price : One hundred fifty only